আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

চতুর্দ্দশ বর্ষ—চতুর্দ্দশ ভাগ।

(১৩১৭ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

সম্পাদক

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়,

আলোচনা কার্য্যালয়, হাওড়া।

Printed & Published by J. K. Singh
at the Karmayoga Printing Works, 4, Telkul Ghat Road,
Howrah.

বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। ডাকমাশুল ।০ আনা।

১৩১৭ সালের সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীকালীকা[illegible]য়ঃ।

আলোচনা

(মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।)

চতুর্দ্দশ বর্ষ। | হাওড়া, বৈশাখ ১৩১৭ সাল। | প্রথম সংখ্যা।

নব বর্ষ।

কালচক্রের অবিরাম আবর্ত্তনে দেখিতে দেখিতে আর একটী বৎসর নদীবক্ষস্থ জল বুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্ত কালসাগরে জন্মের মত বিলীন হইল। আজ নুতন বৎসর, সংসার চক্রের একটী আবর্ত্তন সমাধা হইয়া আর একটী নুতন আবর্ত্তন আরম্ভ হইল, প্রত্যেক জীবই সংসার চক্রে সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করিয়া এক একবার কালকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। নশ্বর জগতের ইহাই অকাট্য নিয়ম, এনিয়মের ব্যতিক্রম হয় না, ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা ইহজগতে কাহারও নাই। যাহা যাইবার—তাহা যাইবে, যাহা আসিবার—তাহা অবশ্য আসিবে, বিশ্বপাতা বিধাতার এই বিচিত্র বিধানে ১৩১৬ সাল চিরতরে লোকলোচনের বাহিভূত হইল। পুরাতন স্রো[illegible] আবার জগতে নুতন স্রোত প্র[illegible]

ইহার সহিত প্রকৃতি-রাজ্যেও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। দুঃখ ভারাক্রান্তা মলিন বসনা স্বভাবসতী আবার জীর্ণবাস প[illegible] ত্যাগ করিয়া নুতন শোভায় সুশোভিত হই[illegible] যেন ব্রীড়াবনতা কুলকামিনী প্রবাসী প[illegible] আগমন আশায় উৎফুল্ল ও আনন্দে আত্ম[illegible] হইয়া পতিপদে প্রণতি করিতেছে। প্র[illegible] সতীর এই নুতন শোভা সন্দর্শন [illegible] জীবমনে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের [illegible] হইতেছে, তাহা লেখনীতে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জীবজগতে প্রতি নিয়তই এই রঙ্গের অভিনয় হইতেছে। এক যাইতেছে, আর এক আসিতেছে, একের উৎপত্তি, অপরের বিলোপ। ভ্রান্তমানব ইহা দেখিয়াও দেখে না, [illegible]

নয়ন পতিত, নূতনের আদর অভ্যর্থনায় ও বিষয় আলোচনায় জগৎ ব্যতিব্যস্ত, অতীতের প্রতি, পুরাতনের প্রতি তাকাইবে কে? সে স্মৃতি কেই বা হৃদয়ে ধারণ করিবে? কিন্তু অতীতের আলোচনায় যে কত অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, তাহা আমরা ভ্রমেও একবার ভাবি না, সে স্মৃতি একবারও আমরা হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করি না। এই যে দেখিতে দেখিতে ১৩১৬ সালের সুদীর্ঘ বারটি মাস কাটিয়া গেল, তাহার ফলাফল চিন্তা করা কি আমাদের উচিত নয়? ১৩১৬ সালের ৩৬৫ দিন আমাদের চক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গেল, জাগতিক জীব-নিবাহের নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুর মধ্যে যে একটী বৎসর কমিয়া গেল তাহা ভাবিয়া আমরা কয়জন কেবলমাত্র ধর্ম্ম চিন্তায় অতিবাহিত করিয়াছি?

পুরাতন বৎসর চলিয়াগেল, জীবের জীবন নাটকের একটী অঙ্কের অভিনয় শেষ হইয়া আর একটী নূতন অভিনয় আরম্ভ হইল। ভক্তবৎসল ভগবানের অপার অনুগ্রহে, করুণাময়ের অসীম করুণায়, সহৃদয় গ্রাহক, পাঠক ও লেখক মহোদয়গণের অনুকম্পায় আমাদের আলোচনা এতাবৎকাল জন সমাজে প্রকাশিত হইয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে,—সংসারের কত প্রকার সুখদুঃখ অনুভব করিতে করিতে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার মস্তকে বহন করিয়া, শুভ বৈশাখ মাসে চতুর্দ্দশবর্ষে পদার্পণ করিল বাঙ্গালার সাহিত্য সমাজে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এই সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর যে সে সাধারণের কতদূর মনস্তুষ্টি করিতে পারিয়াছে, তাহা তাঁহাদেরই বিবেচ্য. দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, নিরপেক্ষ পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন। "আলোচনা" যে এতদিন জীবিত থাকিয়া প্রাণপণে হিন্দু সমাজে আপনার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া, সকলের সেবা করিয়া আসিয়াছে ইহাতেই তাহার পরম তুষ্টি।

আমরা এই, শুভ বৈশাখ মাসে আমাদের সুশিক্ষিত গ্রাহক, অনুগ্রাহক, লেখক ও পাঠকবর্গকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণ করিয়া প্রাণপণে আলোচনার সেবায় ব্রতী হইলাম। দেশ,কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া আমরা দেশের মঙ্গল চিন্তায় কখনই বিরত হইব না। এক্ষণে গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন তাঁহারা যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ রাখেন, আমাদের সহায় হইয়া সদুপদেশ প্রদান করেন, গ্রাহকগণের অনুকম্পাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আজকালকার বাজারে সাময়িক পত্র পরিচালন করা কিরূপ গুরুতর ব্যাপার এবং ব্যয় বাহুল্য তাহা শিক্ষিত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টি না হইলে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব, কেহ কখন হইতেও পারে নাই। ধর্ম্ম প্রচার, আলোচনার প্রধান লক্ষ্য, ধর্ম্মহীন হইয়াই যে দেশের দুর্গতি এত বাড়িয়াছে, দেশে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে—তাহা কে না স্বীকার করিবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেশে ধর্ম্মহীনতাই অবনতির মূল কারণ। এইরূপ ধর্ম্মের প্রতি দেশবাসী যাহাতে

অস্থিবান হইতে পারেন, আমরা তাহার চেষ্টা প্রাণপণে করিব। আলোচনা ধর্ম্মপ্রচারে কিছুমাত্র ক্রটী করিবেনা। গ্রাহকবর্গের উৎসাহ পাইলে যে সে মনের আনন্দে কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ?

আজ নববর্ষে, বৈশাখের এই শুভ বাসরে বাংলার ঘরে ঘরে, হিন্দুরধর্ম্ম মন্দিরে ভগবানের মঙ্গল সঙ্গীত গীত হইতেছে; আমারাও এই নববর্ষে বিশ্ববিধাতার পাদপদ্মে মতিস্থির রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অগ্রসর হইলাম। মানুষ কর্ম্মের অধীন। এই কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য, ফলাফল ভগবানের হস্তে, তিনি আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুন। যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয়, যিনি অনন্ত শক্তির আধার, জ্ঞানের অতীত, যিনি সর্ব্বজীবে সর্ব্বদা সমভাবে বিদ্যমান আছেন, সামান্য কীটাণুও যাঁহার কৃপা লাভে বঞ্চিত হয় না, সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সুখে, দুঃখে আমাদিগের জীবনের এক বর্ষ কাটিয়া গেল, সংসার রঙ্গমঞ্চে আমাদিগের জীবনের এক পট পরিবর্ত্তিত হইল। এই কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কর্ম্মের ক্রীড়া পুত্তলি বিশেষ। জন্ম, মৃত্যু, উত্থান, পতন, হর্ষ, বিষাদ আমাদিগের কৃতকর্ম্মের ফলে পর্য্যায় ক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা সংসার রহস্যানভিজ্ঞ, মোহান্ধ, তাই ঐশ্বর্য্যে আত্মহারা হইয়া নিজের কৃতিত্বের গর্ব্ব করি, বিপদপাতে ভগবানের দোষ কীর্ত্তণ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ পরম পিতা পরমেশ্বরের চক্ষে ধনী, নির্দ্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, উত্তম, অধম সবই এক সমান। তিনি কাহারও সর্ব্বনাশ করেন না, কাহাকেও রাজ্য পদ দেন না। মানব স্ব, স্ব কর্ম্মফলে জন্ম পরিগ্রহ করে, হাসে, কাঁদে, আবার অনন্ত কাল সমুদ্রে জল বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। সংসারচক্রে কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। অই আমরা যেন অসৎকর্ম্মে কর্ত্তব্য পথ ভ্রষ্ট হইয়া, পাপের প্রলোভনে আত্মহারা হইয়া, আমাদিগের জীবনের এই নূতন অধ্যায় কলুষিত না করি, আমরা যেন ভগবানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পবিত্র কর্ম্মের স্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিয়া মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি। দীন, হীন আমরা আজ নববর্ষ-সমাগমে ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে সেই মঙ্গলময়ের শ্রীচরণে আমাদিগের কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি।

নববর্ষের কামনা।

বৎসরের প্রথম মাসেই সম্রাটের আকস্মিক মৃত্যু, ভগবান তাহার আত্মার সদগতি প্রদান করুন। নবীন সম্রাটও সম্রাজ্ঞী দীর্ঘজীবি হউন। রাজ-পরিবারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ, শান্তি বিরাজিত থাকুক। রাজপুরুষগণ ধীর ভাবে, ঔদার্য্য সহকারে রাজকার্য্য পরিচালন করুন। অশান্তির করাল ছায়া শূন্যে বিলীন হউক। রাজা ও প্রজার মধ্যে শান্তি ও সৌহৃদ্য অক্ষুণ্ণরূপে বজায় থাকুক। রাজ্য ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হউক। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সমূহ দেশ হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হউক। প্রজাগণ পরম সুখে কালাতিপাত করিতে থাকুক। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি

জীবিকার পথ প্রশস্ত হউক। ধর্ম্মক্ষেত্রে পংগার পূত প্রবাহ বহিতে থাকুক। শিক্ষার বিস্তার হউক। আমাদিগের ভরসার স্থল যুবকগণ সুপথে হউন। রাজা অপত্য নির্ব্বিশেষে পালন করিতে থাকুন। আং সং।

বর্ষ শেষে।

—ঃ•ঃ—

ডুবিল বরষ এক অতীত নীরে।
সান্ধ্য তমিস্র রাশি,
ফেলিল ধরণী গ্রাসি,
তপন পুনঃ অস্তাচল শিরে।
কিন্তু যে যাইল চলে
অবহেলি কুতুহলে
কভু আসিবে না। চাবে না ফিরে।
যেমন উঠিত চাঁদ
পাতিয়া রূপের ফাঁদ
তেমনি উঠিবে পুনঃ তারা হায় পরে।
মলয় সমীর যথা
নিয়ত কাঁপাত পাতা
কাঁপিবে অফুট কলি সুধীর সমীরে।
ভ্রমর গুঞ্জরি ফুলে
আসিত গো কুতুহলে
আসিবে তেমনি নিত্য উদ্দাম বিহারে।
কিন্তু যে গো চলে গেল
সাথে নিয়ে আঁখি জল
কতই গোপন ব্যথা হৃদয় নিদারে।
কত শত দুঃখ রাশি
কত কান্না কত হাসি
কত দোষ কত ত্রুটি স্মরণে না ফিরে।
সবাই যাইল চলে
সুদূর অতীত কোলে
আর কেহ জাগিবে না সাধিলে কারে।
কনক কিরণ রাশি
পূর্ব্বাশা শিয়রে বসি
সোণার আঁচল লোটা সুমেরু শিরে।
পশ্চিমেতে অন্ধকার
ডুবেযাক্ স্মৃতি তার
উজ্জ্বল ভবিষ্য হের নয়ন ভরে।
স্মরণ করিয়া তাঁরে
রাখ নিজ অধিকারে
কঠিন কর্ত্তব্য রাজী নিত্য অকাতরে।
পালাল বরষ এক
সবধান হয়ে থাক
নূতন বরষ ফাঁকি দেয় বা ফিরে
ডুবিল বরষ এক অতীত নীরে।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আদর্শ হিন্দু রমণী।

—ঃ০ঃ—

চট্টগ্রাম জিলার পটীয়া থানার অন্তর্গত ধলঘাট গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবদাস চৌধুরী মহাশয়ের সতী সাধ্বী স্ত্রী মাতঙ্গী সুন্দরী স্বপরিবার ও প্রতিবেশী নর নারীগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গত পৌষ মাসের ৭ই তারিখ বুধবার শুক্লা একাদশী তিথিতে, পতি, পুত্র কন্যা, পুত্র-বধূ, দেবর ও দেবর পত্নিগণ হইতে চির বিদায় গ্রহণান্তর স্বজ্ঞানে,—মুখে

ভগবানের সুমধুর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ সতী সাধ্বী স্ত্রী মহিলা সমাজে অতি বিরল। তাঁহার চরিত্র অতি সুন্দর ছিল। তাঁহাকে সতী লোপা-মুদ্রা সদৃশা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর দিন কএক ঘণ্টা পূর্ব্বে, পতি পুত্র ও 'জায়া' দিগের সহিত সময়োচিত যে মধুর আলাপাদি করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার সচ্চরিত্রের ও ভগবন্নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাইনিয়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

মৃত্যুর দিবস সতী নিজ পতিকে নিকটে ডাকাইলেন। পতি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন; স্ত্রীর অবস্থা খারাপ ও তিনি ডাকিয়াছেন শুনিয়া পতি পত্নিপাশে ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। দুই এক মিনিট পরস্পর পরস্পরকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন,—কাহার ও মুখে কোন বাক্য স্ফুরণ হইলনা। ইতি পূর্ব্বে তাঁহাদের একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রকে নিষেধ সত্বেও মুড়ি মুড়কি খাইয়াছে বলিয়া সতীর পতি বাহির বাড়ীতে "এতবড় ছেলে হয়েছিস" জ্ঞান নাই! খেয়ে বসিলি, ওর কিছু হলে —ওর যেরূপ অবস্থা—ওর আদ্য ক্রিয়াটি কি করে শুদ্ধ ভাবে হবে? বলিয়া যে গালাগালি করিতেছিলেন, তাহা সতীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। পরস্পর দেখাদেখির পর সতী ধীরে ধীরে তাঁহার দুর্ব্বল হস্তদ্বয় পতির চরণের দিকে প্রসারিত করিয়া অতিকষ্টে চরণ স্পর্শ করতঃ গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—আমি যাইতেছি আমায় বিদায় দিন। আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, নিয়মিত সেবা করিতে পারিনাই—মাপ করুণ। আমার যোগী (যোগেন্দ্র) আমার জন্য সব সময় সর্ব্ব অবস্থায় শুদ্ধ, সে খাইয়া এঁটো হাতে আমার জন্য যাগ করিবে, তাহা অন্যের শুদ্ধ হইয়া করা হইতে সহস্র গুণে শুদ্ধ হইবে; তাহাকে খাবার খাইযাছে বলিয়া কিছু বলিবেন না।" কথা শুনিয়া পতি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না;—সাশ্রু লোচনে গদ গদ স্বরে বলিলেন তুমি আমার নিকট কোন অপরাধ কর নাই। আমি তোমাকে অনেক সময় অন্যায় বলিয়াছি ও তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধী, আমাকে তুমি মাপ কর। তাহাতে সতী বলিলেন,—আপনার কোন দোষ নাই, আমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই মাঝে মাঝে বাকযাছেন মাত্র, আমার জানা অজানা সব অপরাধ আজ যাওয়ার-দিনে মাপ করুন। বলিতে বলিতে সতীর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, তিনি পতির মুখপানে সাশ্রু-লোচনে তাকাইয়া ক্ষণেক রহিলেন। কিছুক্ষণ পর পুনঃ পতির মুখপানে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—"যাওয়ার সময় আর এক শেষ ভিক্ষা, এই দাসীর মাথায় আপনার পাদুটী অর্পণ করিয়া, আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমার কাণে যেন আপনারই মুখে মরণ সময়ে মধুর 'রাম নাম' শুনান হয়।" তৎপরে সতী নবোঢ়া বালিকা পুত্র বধূটিকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং তাঁহার মস্তকে ও পিঠে

সস্নেহে হাত বুলাইতে, বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "মা! আমি চলিলাম, কোন চিন্তা নাই.—আমি আশীর্ব্বাদ করি পতি পুত্র লইয়া সুখে থাক, তোমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে মা! রাখিয়া যাইতেছি, সকাল সকাল দুটী ভাত রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইও, পুত্রের মত যত্ন শুশ্রূষা করিও " "মা! তোমার শ্বশুর ও আমার 'যোগা'কে স্বহস্তে কিছু খাবার দাও, আজ যাইবার সময় দেখিয়া যাই।" বালিকা বধূ অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে ২টি পাত্রে খাবার লইয়া আসিল ও সতীর কথানুসারে দুজনার সামনে এক এক খানি বসিবার আসন দিয়া এক এক গ্লাস জল সহ রাখিয়া দিয়া, শ্বশুড়িকে দুহাতে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া পড়িল, ও অঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল। বলা বাহুল্য পতি পুত্রের খাওয়া হইল না;—চারি ধারে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, এই দৃশ্যে সকলের চোখেই জল আসিল, সতীর পতি পুত্র (তাঁহার শেষ সময়ের কথা রক্ষা করার মানসে) খাদ্য দ্রব্য হইতে কিঞ্চিন্মাত্র লইয়া মুখস্পর্শ করিলেন। সতী পুত্র-বধুর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে, পুত্র যোগেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা! আমার ইচ্ছা ছিল বৌটিকে একখানা সুন্দর বাজু গড়াইয়া দি;—একদিন তোমাকে বলিয়াও ছিলাম, কিন্তু হায়! আমার ভাগ্যে অলঙ্কারটি বৌকে গড়াইয়া দেওয়া হইল না, দেখিয়া গেলাম না, টাকা পাইলে বৌয়ের হাতে তদনুরূপ টাকা দিয়া সাধ মিটাইতাম।" কথা শুনিয়া পুত্র যোগেন্দ্র তাড়াতাড়ি কয়েকটি টাকা আনিয়া মায়ের হাতে দিল। সতী তাহা বৌয়ের হাতে দিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"মা! রাখ, এই টাকায় তোমার জন্য "বাজু" হইবে।" তৎপর জায়া দিগকে নিকটে ডাকাইয়া, একে একে ৮ জন জায়ার হাতে বৌয়ের হাত রাখিয়া সতী বলিলেন—"বোন্! এই বৌ তোমার, আমি চলিলাম দেখিও," যোগার পুত্র কন্যা হইলে, আমার হইয়া নাতী নাতিনী লইয়া খেলিও, বোন্! এই শেষ সময় আমার মুখে তোমরা সকলে একটু গঙ্গাজল কি তুলসীর জল দাও; বোন্! আমি চলিলাম; আশীর্ব্বাদ করি, পতিপুত্রে শঙ্খ সিন্দুর লইয়া চিরজীবন সুখে থাক।" "জায়া" সকলেই একে একে সাশ্রু-লোচনে তাঁহার মুখে জল দিল। পরে পুত্র কন্যা ও উপস্থিত অন্যান্য বালক বালিকা সকলেই সতীর মুখে তুলসীদলসিক্ত জল অর্পণ করিল। সতী সানন্দে তাহাদের মুখ পানে তাকাইয়া পান করিলেন। মৃত্যুর ১৫।২০ মিনিট পূর্ব্বে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া সকলে তুলসী তলায় রাখিল; তাঁহার কথানুসারে পতি সতীর মস্তকে (অনিচ্ছা সত্বেও মরণ সময়ের বাক্য রক্ষা করিতে) ঈষৎ পদস্পর্শ করিয়া দাড়াইলেন ও "রাম নারায়ণ মুকুন্দ মধু সূদন" ইত্যাদি ভগবানের মধুর নাম গদগদ স্বরে কর্ণের নিকট উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, সতীও মৃদু মৃদু "রাম-রাম-রা বলিতে বলিতে পতির মুখ পানে তাকাইয়া সহাস্য বদনে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও চারিটি বিবাহিতা কন্যা;—মৃত্যু সময়ে সকলই তাঁহার নিকটে ছিল। তিনি নিজে লেখা পড়া না জানিলেও, কাশীরাম

দাসের মহাভারত ও কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ শ্রবণে বড়ই প্রীতি লাভ করিতেন ; গৃহ কার্য্য হইতে যে কোন দিন একটু অবসর পাইতেন, তাঁহার "জা"দিগের মধ্যে যাহারা পড়িতে জানেন, তাঁহাদিগকে লইয়া তাঁহাদের দ্বারা পুঁথি পড়াইয়া আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন। সদা সর্ব্বদা পতির অজ্ঞানুগামিনী হইয়া চলিতেন। এ বৃদ্ধ বয়সেও গুরুজনের সাক্ষাতে কখনও উচ্চস্বরে কি কোন অসম্ভ্রম-সূচক কথা বলেন নাই। বর্ত্তমান সময়ের রমণী সুলভ কোন দোষ তাঁহার নিকট কেহ দেখে নাই। পতি ক্ষণক্রোধী, মধ্যে মধ্যে যেরূপ কর্কশভাবে সতীকে গালাগালি করিতেন, তাহা কোন রমণী আজকালের দিনে নির্ব্বাচক হইয়া সহ্য করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। সদা সর্ব্বদা পতির মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার এই সকল অনন্য সাধারণ গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা তাঁহাকে বর্ত্তমান যুগের "আদর্শ হিন্দুনারী" আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হই না। শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী।

অহং তত্ত্ব।

—:০:—

অহংতত্ত্ব, অহং জ্ঞান, অহঙ্কার প্রভৃতি শব্দ একার্থ প্রতিপাদক। এই বিনশ্বর জগতে বিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া, এই, অস্থায়ী সংসারে অস্থায়ীভাবে সামান্য দিনের জন্য আসিয়া, যদি জীব অহংকর্ত্তা, অহংভোক্তা, মমপুত্র, মমৈক কলত্রম ইত্যাদি রূপ ধারণার বশবর্ত্তী হয়, সেই ধারণার নামই অহঙ্কার। আমি করিতেছি, আমি খাইতেছি, আমারই পুত্র, আমারই স্ত্রী; এবম্ভূত ভাব যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া মানবকে তমোভাবাপন্ন করে-তাহারই নাম অহংজ্ঞান। ইহা মুক্তি পথের প্রধান অন্তরায়, যতদিন ভাব থাকিবে, ততদিন তোমার মুক্তির সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। জীব অহংজ্ঞান ভুলিয়া "তত্ত্বমসি" বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলে মুক্তি তাহার করতলগত হইবে।

অহঙ্কারের তুল্য রিপু মানবের আর নাই। ইহাই তাহাদের পতনের একমাত্র কারণ; যাহার অহঙ্কার নাই, তিনি মুক্ত পুরুষ, কিন্তু এই অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, জগতে এমন ব্যক্তি কয়জন আছেন? কেবল মানুষ কেন, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যে প্রায় সকল জীবই অহঙ্কার মত্ত হইয়া ঘোরতর অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। একদিন পরম হংসদেব অহংজ্ঞান ও তত্ত্বমসি সম্বন্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন দেখ, মানুষ ত অহঙ্কারে পরিপূর্ণ আছেই, নিকৃষ্ট জীবগণও ইহা শূন্য নহে। দেখ, গরু দিবারাত্র হাম্বা হাম্বা করিতেছে। সংস্কৃত "অহম" হইতে "হম" হইয়া হিন্দীতে হাম হইয়াছে। সুতরাং "হাম" এর অর্থ আমি; গরু হাম্বা হাম্বা করিয়া অহংজ্ঞান সকলকে বিদিত করিতেছে। তারপর এই গরু কসাইয়ের হস্তে যখন প্রাণদানে উদ্যত, তখনও সে হাম্বা রব ছাড়ে না। তখনও তাহার মুক্তি অনেক দূরে। তৎপরে কসাইয়ের হস্তে পড়িয়া তাহার যে কি পরিণাম হয়-তাহা সকলেই জানেন।

তাহার খিশিত গোশাদকগর্ভের উদর পূর্ণ করিল, চর্ম্ম বিক্রয়ার্থ আপনে নীত হইল, শৃঙ্গ, খুরাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যার্থ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইল, স্নায়ুগুলিও কোনও স্থানে গিয়া তন্তুরূপে পরিণত হইয়া পড়িল। উপযুক্ত ধুনুরী যখন সেই তন্তু লইয়া আপন যন্ত্রে যোজনা করতঃ ঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, তখন তাহা হইতে "তুঁ," "তুঁ" শব্দ বহির্গত হইতে লাগিল। সংস্কৃত ত্বম শব্দ হিন্দীতে তুম হয়। সুতরাং তুম শব্দের অর্থ 'তুমি।" দেখ এতকালে গরু হাম্বাবর ছাড়িয়া, আমিত্ব ছাড়িয়া তত্ত্বমসি বাক্যের "তুঁ তুঁ" করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন সে বুঝিয়াছে-ভগবান! আমি কিছুই নহি, তুমিই জগতের আদি ও অন্ত, তুমিই জগতের স্রষ্টা ও পাতা, তুমি ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই নহে। উপযুক্ত ধুনুরীর হস্তে পড়িয়া গরুর আমিত্ব ঘুচিয়া যেমন ঈশ্বরত্বে পরিণত হয়, সেইরূপ উপযুক্ত উপদেষ্টার হস্তে পড়িলে মানবেরও অহংজ্ঞান ঘুচিয়া যায় এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই মানবের মুক্তি স্বেচ্ছাধীন হইয়া পড়ে। হায়! কবে আমাদের দুর্ব্বল চিত্ত সবল হইবে, কবে আমরা অহংজ্ঞান ভুলিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব! হতভাগ্য মোহান্ধ কলির জীবের পক্ষে কি সে শুভ দিন আসিবে না!

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে অহংকার মুক্তির পথের ঘোর কণ্টক স্বরূপ, তথাপি আমরা তিলেকের জন্য এই বিষম শত্রুকে ছাড়িতে পারি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেনঃ—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

তিনি বলিয়াছিলেন—প্রতিদিন জীব যমসদনে যাইতেছে; তাহা দেখিয়াও যে অপরে এখানে চিরকাল থাকিতে ইচ্ছা করে, ইহার তুল্য আশ্চর্য্য আর কি আছে। এখন প্রতিদিন নহে, প্রতি ঘণ্টায় কত লোক মরিতেছে প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, বেরি বেরিপ্রভৃতি মহামারীতে হুলস্থূল পড়িয়া যাইতেছে কিন্তু তথাপি "আমার আমার" করিতে কয়জন ছাড়িতেছে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কয়জনের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছে?

মানব পুণ্যাত্মাই হউক আর পাপাত্মাই হউক, জীবনান্তে স্থান মাহাত্ম্যে তাহার কথঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। তীর্থবাসে বা শ্মশান ক্ষেত্রে যাইলে পাপী বা পুণ্যাত্মার স্থানমাহাত্ম্যে কথঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। কুক্ষি-কারাগারেও পাপী বা পুণ্যাত্মারও সেই পরম পুরুষের প্রতি ভক্তি নিবদ্ধ থাকে, প্রতিনিয়ত জীব সেই পরমারাধ্য বিধাতা পুরুষের চরণ চিন্তা করিয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু যাই ভূমিষ্ঠ হয়য়া "ট্যাঁ" করিয়া কাঁদিয়া উঠে, অমনি মায়া আসিয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করে মায়া প্রবেশের পরই তাহার তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে মায়ার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে থাকে। ঔষধ উদরস্থ হইবামাত্রেই যেমন তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই চৈতন্যের বিলোপ হয় না। সদ্যোজাত শিশু প্রথমতঃ "কহাঁ এ" কহাঁ এ" অর্থাৎ

"কোথা এলাম "কোথা এলাম" করিয়া কিছুদিন বোকার মত থাকে, তারপর মায়া সম্যক্‌রূপে তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে সে সংসারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। পুনরায় সে মায়াবীর ত্রিগুণে বশীভূত হইয়া "আমার, আমার" করিয়া এই দুর্লভ মানবজন্ম বিষময় করিয়া তুলে।

জাগতিক সমস্ত বস্তুই এক অব্যক্ত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে; ইহাতে তোমার আমার অহংকারের কিছুই নাই। অহংকারের অবশ্যম্ভাবী ফল পতন, অহংকারীর উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—দীনাত্মারাই ধন্য, তাহারাই স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী, অহংকারী ব্যক্তি দীনভাবাপন্ন না হইলে উন্নতির আশা নাই। যে পর্য্যন্ত আমার আমিত্ব না যাইবে, ততদিন যতই ধর্ম সাধন কর না কেন, স্বর্গের দ্বার অর্গলবদ্ধ থাকিবে। মহাভারতে পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণের আখ্যান ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যখন তাঁহারা পঞ্চভ্রাতায় স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর গমন করিয়াই সহদেব প্রথমে ভূপতিত হইলেন। ভীম ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন-সহদেব কাহাকেও আপনার সদৃশ প্রাজ্ঞ মনে করিত না, এই অহংকারেই তাহার পতন হইল। পরে নকুল পতিত হইলে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—সে নিজ রূপের বড়ই বড়াই করিত, এইজন্য এত শীঘ্র তাহার পতন হইল। তাহার পর অর্জুনের পতন হইলে ভীম পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে; ধর্মরাজ বলিলেন—অর্জুন শৌর্য্যবীর্য্যে জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া অহংপতিত হইল। যে ব্যক্তি যদি কখনও আমার উন্নতি কামনা করিবে, তাহার এরূপ অহংকার করা উচিত নয়।

পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে ভীম ও যুধিষ্ঠির অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহারা কয়েক পদ অগ্রসর হইলে, ভীমসেন পতিত হইল। তাঁহার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি অতিরিক্ত ভোজন করিতে এবং অন্যের বল গ্রাহ্য না করিয়া আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে এই জন্য তোমার পতন হইল। তাহা হইলে দেখুন, পাণ্ডবগণের মধ্যে চারি ভ্রাতার পতনের একমাত্র কারণ অহংকার। দর্পহারী কাহারও দর্প রাখেন না। দর্প চূর্ণ করাই তাঁহার কার্য্য তাই তাহার নাম দর্পহারী মধুসূদন। একমাত্র নিরহংকারী যুধিষ্ঠিরই স্বর্গ গমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপর চারিজনে নানাগুণে বিভূষিত হইলেও অহঙ্কারের বশে স্বর্গলাভে বঞ্চিত হইলেন। অতএব যত সৎকর্ম্মই কর, যত সুকৃতি সাধনেই তৎপর হও, অহংকার থাকিলে তাহাতে কোন ফল ফলিবে না। তোমাকে পতিত হইতেই হইবে। অহঙ্কারকে পরাজয় করিতে না পারিলে, তুমি যতই সাধু হও না কেন, মুক্তিলাভে কিছুতেই সমর্থ হইবে না।

হে মানব? এই বিশাল বিশ্বে তোমার ন্যায় কিটানুকীটের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া যদি চিরজীবন অহংকারেই মত্ত রহিলে তবে তোমার আত্মোন্নতির আশা কোথায়? এজগতে তুমি ত সামান্য ধূলিকণারও সমকক্ষ নহ, কালের এক ফুৎকারে

নিমেষ মধ্যে যখন তোমার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তবে দুইদিনের জন্য আসিয়া কেন "আমার আমার" করিয়া অবাধে পাপ সঞ্চয় কর, কেন সাংসারিক মায়ায় আত্মহারা হইয়া পরকাল নষ্ট কর। একবার স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, এজগতে তোমার অহঙ্কারের বস্তু কি আছে? যখন এদেহ তোমার নিজের নহে, যখন এই সৌষ্ঠবান্বিত দেহের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে তোমার কিছুমাত্র জানা নাই। তখন আর কেন বৃথা অহংতত্ত্বে মত্ত হইয়া পরকালের পথ কণ্টকাকীর্ণ কর? যদি আপনার মঙ্গল চিন্তা কর, যদি এই অপার ভবপারাবার অবহেলায় পার হইয়া মুক্তিলাভের আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাক, তবে দীনভাবাপন্ন হইয়া আত্মোন্নতি সাধনে তৎপর হও। আঃ সং।

সাকার উপাসনা।

—:•:—

জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মানব মাত্রেরই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করা উচিত। প্রাণবন্ত হইয়া তাঁহার ধ্যান-ধারণা ও উপাসনায় জীবন উৎসর্গ না করিলে মানুষ মানুষ নামে অভিহিত হইতে পারে না। ঈশ্বর-ভক্তি-বিহীন মানবজীবন বিড়ম্বনা মাত্র, সেই উদ্দেশ্য-হীন জীবন ধারণে কোন ফল নাই। ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ মনুষ্য জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পরিসিদ্ধ করিতে হইলে, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন ও তাঁহার উপাসনা করিতেই হইবে।

পাত্র বিশেষে এই উপাসনা কেহ বা সাকার কেহ বা নিরাকার ভাবে করিয়া থাকেন। যাঁহারা তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত মুক্ত জীব, অর্থাৎ যাঁহারা সোঽহং-ভাবাপন্ন, যাঁহারা ঐশ্বরীক ভাবে সদাই বিভোর, আমরা তাঁহাদের কথা এখানে বলিব না। কারণ তাঁহাদের পক্ষে সকলই সম্ভব, সাধক যখন শীর্ষ সমাসীন-তুরীয় অবস্থা, প্রাপ্ত, সাধক যখন নিজেকে পরমহংস বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহার আর উপাসনা অর্থাৎ উপকার প্রত্যাশায় ভগবানের অনুভূতি করিবার আবশ্যকতা থাকে না। সচ্চিদানন্দ ময় পরব্রহ্মের ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাই তখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ও মুখ্য কর্ম্ম হইয়া থাকে। তখন ভগবানই স্বয়ং তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক স্বরূপ, তখন ভক্তের যাহা ইচ্ছা ভগবানকে তাহা করিতে দিতে হইবে। তখন সাধক সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম"নিরাকার ব্রহ্মকে যেরূপে হউক উপলব্ধী বা আয়ত্ত করিতে পারেন। বহির্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি যাঁহার সমভাব তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কি? কিন্তু নিম্নশ্রেণীর সাধকের পক্ষে, তোমার আমার পক্ষে, সেই বিরাট চৈতন্যময়ের বিরাট মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিবার ক্ষমতা কোথায়? সেই বিরাট পুরুষের মূর্ত্তি কল্পনার সাহায্যে হৃদয়ে স্থাপন করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। ভাগবতে লিখিত আছেঃ—পাতাল সেই মহাপুরুষের অধোভাগ, রসাতল তাঁহার পদের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ, মহাতল তাঁহার গুলফ দেশ এবং তলাতল জঙ্ঘা। সুতল সেই বিরাট মূর্ত্তির উভয়-জানু এবং বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়। মহীতল তাঁহার জঘন এবং নভোমণ্ডল তাঁহার নাভি সরোবর, স্বর্গলোকি

তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তাহার গ্রীবাদেশ, জনলোক তাহার আনন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্য লোক সেই সহস্র-শীর্ষ বিরাট পুরুষের শিরোভাগ। এইরূপ যে মূর্ত্তি তাহাই পরব্রহ্ম. সংসার মোহান্ধ জীব কি এই মূর্ত্তি ধারণায় আনিতে পারে? যখন পারিবে তখন সেই সাধকই "তত্ত্বমসী" লাভ করিয়াছে; তখন সেই সাধকই "সোহং" বলিতে পারিয়াছে। জীবের এ অবস্থায় আর কোনও ক্রিয়া নাই, তখন ব্রহ্মজ্ঞ সাধক সেই আনন্দময়ের আনন্দ-সুধা পানেই বিভোর, তখন সাধক দেখিবেন অনন্ত বিশ্বব্যোম ব্যাপী বিরাট পুরুষ, তখন আর কিছু নাই - সেই এক অদ্বৈত ভগবান। তখন আর সাধনা নাই, ধারণা নাই উপাসনাদি কিছুই নাই। যিনি এ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছেন, তিনি ধন্য। কিন্তু সামান্য অধিকারীর পক্ষে কি ইহা শূন্যে গৃহ নির্ম্মাণের ন্যায় বিফল নহে? প্রথমেই এরূপ সাধনার পক্ষপাতী হইলে তাহা পণ্ডশ্রম নয় কি? আদর্শ না হইলে শিক্ষা, জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হয় না, এইজন্য সাধারণের পক্ষে, সাকার উপাসনায় মনোনিবেশ করা নিতান্ত প্রয়োজন। যখন উপাসনা, যখন ধ্যান-ধারণা তখনই কল্পিত মূর্ত্তি আছে. নতুবা ধ্যানধারণা ও উপাসনা কাহার জন্য? নিরাকারের ধ্যান ধারণা বা উপাসনা ত হইতে পারে না। এইজন্য যে, যে অবস্থার লোক, তাঁহাকে সেইরূপ সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। আমি যথার্থ শাস্ত্র নহি, তথাপি সাকার ছাড়িয়া অচিন্তনীয়,জ্ঞানাতীত ভগবানকে নিরাকার ভাবে ভজনা করিতে গেলেই উঁ বিভ্রাট হইবে, আর সেই জন্যই ত আজকাল ধর্ম্ম জগতে এত বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে? নিশ্বাস ব্যতীত জীবের জীবন ধারণ যেমন অসম্ভব, এই পৃথিবীতে সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সেই নিরাকার ব্রহ্ম-ধারণাও তদ্রুপ অসম্ভব। এই জন্য পুরাকালে মহর্ষিগণ প্রথম অধিকারীর জন্য, অজ্ঞ, লোকের জন্য এই সাকার উপাসনার প্রচলন করিয়া গিয়াছেন।

নিরাকারের উপাসনা বড়ই কঠিন—এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাকে ভাবিতে হইবে, যাঁহার ধ্যান ধারণায় চিত্ত সংযত করিতে হইবে, তাঁহার একটী মূর্ত্তি অবশ্যই হৃদয়ে অঙ্কিত করা উচিত, নতুবা ভাবিব কি; কাহার ভাবনা ভাবিব? যাঁহাদের বহুকষ্টে, ভাবিয়া চিন্তিয়া ভগবানের ভাবনা হৃদয়ে ভাবিতে হয়, তাঁহাদের সাকার ভাবে না ভাবিলে আর উপায় কি? যাঁহাদের ভাবিতে হয় না, যাঁহারা সোহং ভাবে পূর্ণানন্দ ভোগ করিতেছেন, যাঁহারা সেই প্রেমময়ের প্রেম-সাগরে অবগাহন করিয়া আপনহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে তুমি, আমি বা এই জগত সংসার কিছুই নয়। যখন আমার আমিত্ব নাশ হইয়া ঈশ্বরত্বে পরিণত হইবে, তখনই নিরাকার, তখনই একমেবাদ্বিতীয়ম ভাবের উদয় হয়। যখন আমি নাই, যখন জগত নাই, তখনই ঈশ্বর নিরাকার যে, সেকি এ ভাবনা ভাবিতে পারে? অজ্ঞ সাধক নিরাকার উপাসনায় আশু ফল প্রাপ্ত না হইয়া বরং অজ্ঞানতা বশতঃ পাছে ধর্ম্মবন্ধন-বিচ্যুত হইয়া পড়ে. পাছে তাহারা একেবারে নাস্তিক হইয়া দাঁড়ায়, এইজন্য নিরা-

কারের সাধক, মহাজ্ঞানী ঋষিগণ তাঁহাদের জন্য সহজ-সাধ্য সাকার উপাসনাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রানুমোদিত সাকার মূর্ত্তির পূজা ও উপাসনাদি করিলেই বিবেক বুদ্ধি প্রখর হয়, ভক্তি প্রগাঢ় হয়, ঈশ্বর-প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয়। এইজন্য অজ্ঞ সাংসারিকের পক্ষে সাকার উপাসনাই প্রশস্ত, ইহা না করিলে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হইবে। কে কবে সোপানাবলী আরোহন না করিয়া একেবারে অট্টালিকার শিরোভাগে উঠিতে পারিয়াছে? বৃক্ষের শীর্ষস্থানে উঠিবার মানস করিয়া কেনা তাহার কাণ্ডের আশ্রয় লইয়া থাকে? সেইরূপ সামান্য অধিকারী মানব সাধনা বৃক্ষে আরোহন করিতে ইচ্ছা করিলে, সাকার উপাসনা ত্যাগ করিয়া কিরূপে একেবারে নিরাকার সাধনার অধিকারী হইবে?

যাহারা উপাসনা করিবে, উপাস্য দেবতাকে তাহাদের ভাল করিয়া জানা একান্ত আবশ্যক। যদি ভগবান সচ্চিদানন্দময় নিরাকার ব্রহ্মই হইলেন, যদি সেই বিরাট পুরুষ অনাদি অনন্ত, অব্যয়, অবাঙ্মনসগোচর, অসীম হইলেন, ইহাই যদি তাঁহার স্বরূপ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তবে সসীম মানবের পক্ষে সেই অসীম ধারণা করিতে যাওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যে ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাণ্ডুনন্দন, মহামনা অর্জ্জুন, একদিন আত্মহারা, দিশাহারা হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যোগীশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব ত্রিলোচন নিরন্তর শ্মশানে মশানে যোগ সাধনা করিয়াও যাঁহার কণামাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সংসারাসক্ত সামান্য মানবের কি সাধ্য যে সেই ব্রহ্মের নিরাকার মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

এই সাধনার সহজে কৃত কার্য্য হইতে পারিবে না বলিয়াই স্থূলরূপে তাহার মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করা একান্ত আবশ্যক এবং এই স্থূল মূর্ত্তির উপাসনাই সাকার উপসনা। এই জন্য আমরা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, শিব, গণেশ বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করি, এই সকল মূর্ত্তি দর্শন করিলে, হৃদয়ে স্বতঃই ভক্তির উদ্রেক হয়। সংসার দাবদগ্ধ মানবের বিশুষ্ক হৃদয়-ক্ষেত্র ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। পূতমন্ত্রের দ্বারা যখন সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া তাহার পবিত্রতা সংসাধিত হয়, যখন আমরা সেই ভাব হৃদয়ে ভাবনা করি, তখন মনে যেরূপ অব্যক্ত আনন্দ উপজিত হইয়া থাকে, নীরস নিরাকার সাধনা কি আমাদিগকে সে আনন্দ প্রদান করিতে পারে? আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার গৃহ, আমার সংসার যাহার মূলমন্ত্র, এরূপ অহং ভাবাপন্ন ব্যক্তির একেবারে সেই সোহং ভাবের ভাবনায় চিত্ত সংযত করিতে যাওয়া কি মূর্খতা নহে?

আমরা যখন যে সাকার মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া পূজা করি, তখন সেই মূর্ত্তিই আমরা বিশ্বরূপ ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়াই পূজা করিয়া থাকি। পার্থিব উপাদানে গঠিত বলিয়া সেই মূর্ত্তির প্রতি হিন্দুর তখন সে চিন্তা থাকে না। ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানেই হিন্দুর সাকার মূর্ত্তির অর্চ্চনা এবং সেই সাকার মূর্ত্তির বিষয় শাস্ত্রে

এক স্থানে ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেনঃ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম,
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ।

ধর্ম্মবিপ্লবের সময় জগজ্জীবের জন্য তিনি যে স্বয়ং অবতাররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এ কথাও তিনি অর্জ্জুনকে গীতায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেনঃ—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

পাঠক! এ তোমার আমার কথা নহে, হিন্দু ধর্ম্মের সারগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-কমল বিনিঃসৃত। তবে এ মূর্ত্তি পূজায় দোষ কি? এ পূজায় কি সেই পরমেশ্বরের পূজা করা হইল না? প্রতিমা পূজা ও ঈশ্বর পূজা হিন্দুর চক্ষে এক, প্রতিমাই যে ভগবানের বাহ্যরূপ। হিন্দুর প্রতিমা পূজকের মধ্যে যত উন্নত ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন, তত আর অন্য কোন জাতির মধ্যে নাই! প্রতিমা পূজাই ধর্ম্মজীবনের বাল্য-ক্রিয়া। হিন্দুর ধর্ম্ম-সাধনা স্বভাবতই উন্নতির দিকে অবিরাম গতিশীল। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারলাভই তাহার চরম উদ্দেশ্য। প্রথমে তাহারা পুতুল খেলা করে বটে কিন্তু সেই পুতুল খেলাই পরিণামে তাহাদিগকে ঈশ্বর সমীপে লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। কলিকাল পাবনাবতার, নদীয়া চাঁদ শ্রীচৈতন্যদেব সাকার উপাসনার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। পণ্ডিত সার্ব্বভৌম যখন তাঁহাকে নানাশাস্ত্র হইতে নিরাকার ব্রহ্মের বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি কয়েকদিন তাঁহার কথার কোন উত্তর প্রদান করিলেন না, বোধহয় তাঁহার এ উপদেশ প্রেমের অবতার চৈতন্যদেবকে ভাল লাগে নাই। এইজন্য সাকার উপাসনা বা প্রতিমা পূজাই যে আমাদের উদ্ধারের শ্রেষ্টতম উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বালক চিরকাল বালক থাকে না, আজ যে বালক, কিছুদিন পরে সেই আবার বালকের পিতা হইবে। সেইরূপ প্রতিমা পূজারূপ বাল্যক্রিয়া অভ্যাস করিতে করিতে পরিশেষে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। যে প্রতিমা পূজা করিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে, প্রতিমা পূজা করিয়া যে সর্ব্বার্থসার ভক্তি রত্ন লাভ করিতে সমর্থ হয়—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবে যাহারা সাধনায় নিরত হয়, কালে তাহারাই ভগবদ্দর্শনলাভে সক্ষম হইতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনে গোপিকাগণ সাকার ভাবে এই সাধনার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন।

উপাসনা করিতে হইতে চিত্তশুদ্ধি, একাগ্রতা বিশ্বাস, ভক্তি এ সকলের একান্ত আবশ্যক, নতুবা একেবারে উন্নতি-মার্গে আরোহন করিতে গেলেইত পতন অনিবার্য্য। যে কখন নদী দেখে নাই, তাহার নিকট সমুদ্রের বিষয় বর্ণনা করিলে সে যেমন কিছুই বুঝিতে পারে না। সেইরূপ সাকারে যাহার একাগ্রতা স্থাপিত হয় নাই, নিরাকারে তাহার বিশ্বাস কেমন করিয়া হইবে, এইজন্য শাস্ত্রকারেরা অধিকারী ভেদে উপাসনার নিয়ম প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ ঐ সকলের নিয়ম প্রণালী স্বতন্ত্র হইলেও উদ্দেশ্য এক ব্রহ্ম-লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ভাই হিন্দু! তোমাদের এরূপ সরল ও

সহজ উপায় থাকিতে কেন অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আপনার পরকাল নষ্ট কর, ইষ্ট [illegible] কেন অনিষ্টের পথে অগ্রসর হইয়া মনুষ্য [illegible] অযোগ্য হও? কর ভাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু! ভক্তি প্রাবল্যে, একান্ত মনে সেই বিশ্বময়ের মূর্ত্তি গঠন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা কর, তাঁহার উপাসনায় মনপ্রাণ আহুতি দাও, তোমাদের মঙ্গল হইবে, পরকালে এই মূর্ত্তি পূজাই তোমায় মুক্তি লাভে সমর্থ করাইয়া দিবে। আঃ সং।

দাতা ও দানশক্তি।

—ঃ•ঃ—

একদিন এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষেই দানশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। একদিন দানশক্তি প্রভাবেই ভারতবাসী সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এরূপ অকাতরে দান করিতে আর কোনও দেশের লোকই পারিত না—ইহা কে না স্বীকার করিবে।

এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষেই একদিন ধার্ম্মিক প্রবর বলিরাজার ন্যায় দানশীল মহাত্মা জন্ম-গ্রহণ করিয়া নিজ দানশক্তি বলে সকলের দারিদ্র্য কষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। একদিন এই ভারতবর্ষেই দরিদ্রের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হইতেন জলসত্র, অন্নসত্র খুলিয়া এদেশের লোকে দরিদ্রের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতেন। নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও এদেশের লোক পরের দুঃখ দূর করতঃ জগতীতলে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

অর্থ থাকিলেই দাতা হইতে পারা যায় না। প্রকৃত দানশক্তির ক্ষমতা স্বতন্ত্র, সে শক্তির পরিচালন অন্য প্রকার, সে শক্তির শক্তি অসীম। সেই অসীম অনন্ত শক্তিতে যিনি শক্তিমন্ত, এই নশ্বর মানব দেহ ধারণ করিয়া তিনিই ধন্য, বরেণ্য এবং প্রাতঃস্মরণীয়। দান করিলে দাতার ধনের অপব্যয় করা হয় না, তাঁহার ধন ক্ষয় হয় না। যাহারা দান করেন না, যাঁহারা কৃপণ তাহাদের ধন সময়ে সময়ে অপব্যয় হইয়া থাকে। কৃপণের ধন বৃথা ব্যয়িত হয় কিন্তু দাতার ধন সেরূপ হইতে পারে না। দাতার দান সঞ্চয়-মূলক, আর কৃপণের সদাই অভাব, তাহার ধন পিপাসার শান্তি কিছুতেই হয় না। তাহারা চিরকালই অর্থ অর্থ করিয়া অনর্থ ঘটায়, ইহ ও পরকালের মঙ্গল চিন্তা তাহারা একেবারে বিস্মৃত হইয়া সকল দিক নষ্ট করে।

আমাদের আর্য্য শাস্ত্র দান শক্তিকেই মহাশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই শক্তি বলে বলীয়ান পুরুষকেই মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহার দানশক্তি প্রবল জগতে তাঁহার জন্মই সার্থক, তিনিই ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষ। দাতা দান-শক্তি প্রভাবে জগতে চিরস্মরণীয় হইতে পারেন ও অন্তে পরম পদ লাভ করিয়া জগতের সকল যন্ত্রণা হইতে পরিমুক্ত হন। দানের তুল্য সৎকার্য্য আর নাই। যদি জগতে কোন ধর্ম্ম-কার্য্য থাকে; তবে সে

দাতার দানশক্তিতেই আছে। এই জগতে চির প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যদি কোন শক্তি থাকে তবে সে দানশক্তি, মরজগতে অমরত্ব লাভ করিতে এরূপ শক্তি আর কিছুই নাই। তাই ত কবি বলিয়াছিলেনঃ —

দানই ধর্ম্ম, দানই কর্ম্ম, দানই ত্রিদিব বাস,
দানই শক্তি, দানই মুক্তি, দানই যমের ত্রাস॥

দীন, দুঃখী, সহায় সম্পত্তি হীন ব্যক্তিগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় এবং সেই সকল অভাগাদের কষ্ট মোচন জন্য যিনি অকারতে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, তিনি নরাকারে দেবতা, কিন্তু এরূপ দেবতা আজকাল কয়জন আছেন, কয়জন লোকই বা আজকাল প্রকৃত অভাবে দান করিয়া দানের প্রকৃত ফল লাভ করিতে সমর্থ হন?

প্রচুর-পরিমাণে ধন থাকিলেই দান করিতে হইবে নতুবা নয়, আমাদের আর্য্য-শাস্ত্রের উপদেশ তাহা নহে। যাহার যেরূপ শক্তি তিনি সেইরূপ দান করিবেন। দান সৎ প্রবৃত্তি মূলক মহাধর্ম্ম, গৃহী ইহা প্রতিপালন না করিলে, পতিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সংসারী ব্যক্তিকে দান না করিয়া জল গ্রহণ করিলে, মহাপাতক জনিত পাপভাগী হইতে হয়, এইজন্য আমাদের দেশে মুষ্টিভিক্ষার নিয়ম চির প্রচলিত রহিয়াছে। ইহা প্রায় সকল অবস্থার লোকেই করিতে পারে, কিন্তু হায়! বাঙ্গালী দিন দিন এত অধঃপতিত হইতেছে যে এ প্রথাও আর মানিয়া চলে না। এখন প্রত্যহ মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্ত্তে সপ্তাহে একদিন মাত্র ধার্য্য হইয়াছে, তাহাও নাম মাত্র। পরন্ত পক্ষে ভিখারীকে ফিরাইলে মহাপাপ হয়, তজ্জন্য আপনার ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাই শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্য আদায় গচ্ছতি"

অতিথি বৈমুখ হইলে পুণ্য গ্রহণ করতঃ তাহার যাবতীয় পাপ গৃহীকে প্রদান করিয়া গমন করে, এই সকল বাক্য কি আর এখন সভ্য সমাজে গ্রাহ্য হইতে পারে? আজকাল অনেক মহাত্মা আছেন যাঁহারা দান করিয়া লোকের নিকট তাহা প্রচার করিতে বড় ভালবাসেন, দান করিয়া সংবাদ পত্রে ছাপাইয়া দেন। আমরা এরূপ দাতাকে "দাতা" বলিয়া গ্রাহ্য করি না এবং আমরা এরূপ দানের পক্ষপাতীও নহি। "গুপ্ত দানং মহাপুণ্যং" গুপ্তভাবে দান করিলে সাত্ত্বিকভাবে দান করা হয়। দান করিয়া যদি অহঙ্কারের বশীভূত হইব, যদি সকলের নিকট শ্লাঘাই করিব, তবে আর দানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইল কই? আপনাকে নিরহঙ্কারী প্রতিপন্ন করা হইল কই? যাহাতে মনের মধ্যে অহঙ্কার না আসে সেইরূপ শক্তিই যথার্থ দানশক্তি এবং সেইরূপ দানই প্রশংসনীয়।

দাতা প্রকৃত অভাবেই আপনার দানশক্তি গুপ্তভাবে পরিচালন করিবেন। যেখানে অভাব-নাই, সেখানে কেবল নাম বাজায় করিবার জন্ম অজস্র অর্থব্যয় করা মূর্খতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তৈলাক্ত মস্তকে তৈল অর্পণ না করিয়া তৈলবিহীন মস্তকে তৈল প্রদান করাই উচিত। প্রকৃত

অভাবে একটি পয়সা দান করিলে যে ফল হয়, অভাবশূন্য ব্যক্তিকে লক্ষ টাকা দানেও তদ্রূপ ফল হয় না। সৎপাত্রে বিতরণ না করিলে প্রকৃত দান কথিত হইতে পারে না। "দানং সৎপাত্রে বিতরণং"।

মনে করুন, একজন ধনবান ব্যক্তিকে যদি আপনি সামান্য অর্থ প্রদান করিতে যান তবে আপনাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে কিন্তু যদি আপনি একটী ভিখারীকে সময়ে একটি পয়সা দান, করেন তাহা হইলে সে আপনাকে কত আশীর্ব্বাদ করিবে। দাতঃ। সেই আশীর্ব্বাদে কি তোমার পরকালের পথ মুক্ত হইবে না?

একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "দরিদ্রান ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম।" পাঠক! ভগবানের ঐ কথা, তোমার শাস্ত্রের অমোঘ উপদেশ, কি তোমার স্মরণ নাই! তোমার হিন্দুধর্ম্মে দানই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভাই হিন্দু! ধর্ম্মই যখন তোমার প্রাণ, ধর্ম্মই যখন তোমার মান, ধর্ম্মেই যখন তোমার এই সুবিশাল দেহ গঠিত হইয়াছে, তখন ধর্ম্মের প্রকৃত পন্থা দানশক্তি কেন বিস্মৃত হও, অবস্থা অনুসারে সকলেই দান করিতে শিক্ষা কর পরের দুঃখ দেখিয়া আপন হৃদয়ে ব্যথা অনুভব কর, হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল হইবে, তোমার পুণ্যের পথ প্রসারিত হইবে। আঃ সং।

বিশ্বপতি।

—:*:—

১

আমি, তোমারি চরণ লইয়ে,
জগতে আছি হে বাঁচিয়ে,
তুমি, সখারূপে মোরে—হৃদয় মাঝারে
সাদরে,—
লবে কিনা লবে তুলিয়ে?

(২)

তুমি, সখিরূপে প্রেম বিতরি,
আমি, আবেশে আপনা পাসরি,
প্রেম সাগরে—একাকী সাঁতারি
হৃদয় এলায়ে যাইব ভাসিয়ে
গাহিয়া তোমারি গান;
তুলিয়া মধুর তান।

৩

প্রভু, তোমারি উজল বরণে,
দেখ, জগৎ প্লাবিত কিরণে,
দেখ, সাজিল নূতন ধরনে,
কিবা অপরূপ—ওহে বিশ্বরূপ
তোমারি মহিমা-রেখা;
ঝিনুকের গায় লেখা।

৪

হের, উত্তাল সরসী সলিলে,
হের, শৈবাল জড়িত মৃণালে,
যেন, ভুজঙ্গ বেষ্টিত কমলে,
বাঁধিয়া কবরী—মোহিনী মাধুরি
তোমারি রূপ ঝলকে;
কমল-চিত্র ফলকে।

ওই, প্রভাত কুসুম নিকরে,
ওই, কুহু কুহু কুহু নিকরে,
ওই, অপার অসীম-সাগরে,
মিলাইয়ে তান—মিশাইয়ে প্রাণ
তোমারি করে সাধনা ;
গাহিয়া স্তব বন্দনা।

৬

আমি, তোমারি চরণ লাগিয়ে,
আকুল অধীর ভাবিয়ে,
সারা হই সুধু কাঁদিয়ে ;—
অন্তরে।
তোমারি বেদনা সোহাগ যাতনা
ইহা বিনা আশা নাই ;
যেন, অন্তিমে চরণ পাই।
প্রভু, ধর্ম্ম কর্ম্ম তুমিই মোক্ষ,
প্রেম প্রীতি তুমিই সখ্য,
চরমে ও চরণ লক্ষ্য—
আমার ;—
প্রেমের জলধি—কাঙ্গালের নিধি
তুমি, কাঙ্গাল সম্বল আর ;
প্রভু ! ঐই বিশ্বে সবাকার।

শ্রীপ্রমথ নাথ সরকার।

মুক্তি।

—:০:—

মুক্তি ?—সে কেমন, কেমনে বুঝিব মোরা,
কঠোর শৃঙ্খলে যুগল চরণ বদ্ধ
রয়েছে যা'র, কারাগে রয়েছে তা'রা,
জীবন আঁধারে মোরা যেন জড়পদার্থ।
কিন্তু যেবা পাইয়াছে সেই প্রসাদের
তুচ্ছ নিগড়ে তারে পারে কি বাঁধিতে ?
ভাদ্রের দুকূল ভরা নদী যবে ছুটে
তুচ্ছ বালির বাঁধ পারে কি রোধিতে ?
চল তবে যদি পাই সে দুর্লভ ধন,
ভেঙ্গে ফেলি তুচ্ছ ও ঘৃণিত শৃঙ্খলে ;
কুলিশ-কঠিন-হৃদে করিলে সাধন
শত শত বাধা বিঘ্ন যাবে দূরে চলে।
সুধাময়ী মুক্তি স্পর্শে দাসত্ব জীবন
পাইবে নবীন বল, দেখিবে ভুবন।

শ্রীলাল গোপাল মিত্র।

কে কোথায় যায়। *

—:০:—

১

বল সবে, জগতের একি ভাবোদয়,
এই যে গো প্রাণিগণ
নিত্য কর্ম্ম আচরণ
করে, বল মুহূর্ত্তে কি হয় সমুদয়।

২

কি আশ্চর্য্য মনোলোভা,
বিমল চাঁদের শোভা
নিশা অবসানে বল ভাই বা কি হয় ?

* কবিতা-লেখিকা কখন ইংরাজি পুস্তক দেখেনও নাই, সামান্য বাঙ্গালা ছাড়া আর কিছু জানেন না, অথচ কবিতাটির স্থানে স্থানে কোন কোন ইংরাজি কবিতার ভাবের অভি-ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয়ের ভাবের সাম্যই বোধ হয় এই সমতার কারণ।

শ্রীযদু নাথ চক্রবর্ত্তী।

৩

স্নিগ্ধ মোহন মূরতি
ধরি আসে ঊষা সতী
খরতর রবিকরে কেন বা বিলয় ?

৪

এই বেগে আসে জল,
করে ধরা রসাতল,
আবার ক্ষণেক পরে কোথা চলে যায় ?

৫

শীতের তুষার ঘন,
বসন্তের সমীরণ,
গ্রীষ্ম আগমনে বল কোথায় পালায় ?

৬

যে ঋতুর যে সকল
নানাজাতি ফুল ফল
সময়ে বিলয় হয়, সময়ে উদয় ?

৭

কিন্তু হায় প্রাণিগণ
করে নাকো আগমন
বল তারা কোন্ সুখে, কোথা, কেন, রয় ?

৮

সদা যারে জীবগণ
বলে শান্তি নিকেতন,
তথা গেলে প্রাণী বুঝি আসিবার নয় ?

৯

সেই যে অনন্তধাম
শান্তিময় যার নাম
শুধুই কি শান্তিময় ? আর কিছু নয় ?

১০

রে ভ্রান্ত, এ পৃথিবাসে,
আছ যাঁর আজ্ঞা-বশে
তাঁর এ সংসার বটে শুধু পরীক্ষার ;

১১

আজ্ঞায় এসেছ ভবে,
ইঙ্গিতেই যেতে হবে,
তাঁহারি ইচ্ছার জয় হবে অনিবার।

১২

এ সংসার নাট্যশালা,
যত দেখ লীলা খেলা
সকলি তাঁহারা যাঁর পরমেশ নাম।

১৩

প্রেমময় মন যার
সে পায় চরণ তাঁর
যতনে রাখেন তারে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।

১৪

তাই যারা যায় সেথা
আর না ফিরিয়া হেথা
আসে কভু, চিরকাল পদে বাঁধা রয়।

১৫

এ সংসার স্বার্থে ভরা
তাই কেঁদে মরি মোরা
প্রিয়বস্তু যদি হায় ছেড়ে চলে যায়।

১৬

যা কিছু আমার ভাল
সব হয়ে গিয়ে কাল
যে চরণে রেখেছে সঁপি ; ফিরায়ে না চাই ;

১৭

আমারে বলগো সবে
আমি তাঁরে পাব কবে,
কি করিলে সে চরণে আমি পাই ঠাঁই।

১৮

পাই কি না পাই কোথা,
খুঁজিয়া দেখিব হেথা,
অথবা উদ্দেশে তাঁরে করিয়া প্রণাম।

১৯

জীবনের কটা দিন
কাটাইব হয়ে দীন
সে শুভ দিনের আশে জপি তাঁর নাম।

শ্রীমতী সরোজিনী দাসগুপ্তা।

বালক বীর।

—:০:—

(ফরাসী হইতে অনুবাদিত)

প্যারিপিইয়া নামক সহর হইতে এস্তাঙ্গেল গ্রাম কয়েক মাইল মাত্র তফাৎ। গ্রামটি ক্ষুদ্র, লোকের বসতিও বেশি নহে। গ্রামের পশ্চাৎ ভাগে কেবল পাহাড়—অত্যুন্নত গিরিশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে। দিবাভাগে সেই পর্ব্বতে উঠিলে পাদমূলে অবস্থিত এই গ্রাম খানি একখানি মনোহর বাগানের মত দেখাইত. সমুদ্র সেখান হইতে নিতান্ত নিকট না হইলেও নিস্তব্ধ রাত্রিতে তাহার তরঙ্গগর্জ্জন এত স্পষ্ট শোনা যাইত যে তাহা শুনিতে শুনিতে গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি ঘুমাইয়া পড়িত। গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুল ছিল। তাহাতে অনেকগুলি ছেলে পড়িত এবং তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলে তাহাকে "ফ্রাঁসোয়া আঁরাগেঁ" বলিয়া ডাকিত। তাহার বয়স বড় জোর সাত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

তখন স্পেনের সহিত ফ্রান্সের যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছিল। সে সময় চারিদিক হইতে বহুতর সৈন্য রণোৎসাহে উপস্থিত হইয়া এস্তাঙ্গেল গ্রামের ভিতর দিয়া সমরক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিত; এবং তাহাদের পদবিক্ষেপের তালে তালে অগ্রবর্ত্তী ব্যাণ্ড যে সুমধুর বাজনা বাজাইত তাহা শুনিবার জন্য গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধ সকলেই কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রাস্তার ধারে আসিয়া দাঁড়াইত। কখন কখন একটি বালক পুষ্পকানন হইতে কুসুমমঞ্জরী সংগ্রহ করিয়া সৈন্যদিগের উদ্দেশে ধরিয়া থাকিত, তাহাদের মধ্যে কেহ বা সেই প্রফুল্ল উপহার সাদরে গ্রহণ করিয়া সস্নেহে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিত এবং চলিতে চলিতে অনেক বার মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া লইত—বেচারা হয়ত আপন গৃহে অমনই একটি অন্তরের সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।

একদিন অতি প্রত্যূষে ফ্রাঁসোয়া শয্যাত্যাগ করিল এবং মার নিকট হইতে চুমুক কতক চা পান করিয়া রাস্তায় বাহির হইল। তখনও অন্ধকার একবারে বিলীন হয় নাই; দূরস্থ অঙ্গুরক্ষেত্র এবং অনতিদূরস্থ জলপাই গাছের ঝোপ সকল ঈষৎ কাল দেখাইতেছে। পাহাড়ের ও পার হইতে সূর্য্য উঠিবে উঠিবে করিতেছে, তাহার হেমাভ ছটারাশি শৈলশিখরে এবং

মেঘের আদরের চাদরে বিকশিত হইতেছে। তখন পাতার পাতায় ফোঁটা ফোঁটা শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। দুই, একটি প্রজাপতি সবে সাধের এ ডাল ও-ডাল করিয়া বেড়াইতেছিল।

সেই বিচিত্র রংএ চিত্রিত প্রজাপতি গুলির মধ্যে অন্ততঃ একটিকেও ধরিবার জন্য ফ্রাঁসোয়ার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রজাপতি ধরা দেয় না, কেবলই আয়ত্তের ঊর্দ্ধে নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়ায়। বালক যতবার চেষ্টা করে ততবারই বিফল হয়। ক্রমে রোক্ চাপিয়া গেল এবং ধরি ধরি করিতে করিতে অবশেষে সে চৌরাস্তার মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল। তখনই ভজনালয়ে প্রভাতী ঘণ্টা বাজিতে আরম্ভ করিল এবং প্রত্যেক গৃহস্থের প্রাঙ্গণ হইতে তারকণ্ঠে কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল।

সহসা ফ্রাঁসোয়ার বোধ হইল দূরে একদল সৈন্য আসিতেছে—কিন্তু তাহাদের সম্মুখে কোন প্রকার বাদ্য অথবা পতাকা নাই কেন? বালকের মনে বিস্ময় জন্মিল, সে প্রজাপতি ধরিতে ক্লান্ত হইয়া যে তুরঙ্গশ্রেণী ধূলি উড়াইয়া পূর্ণবেগে ছুটিয়া আসিতেছিল, তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইলে ফ্রাঁসোয়া দেখিল ইহারা শত্রুসৈন্য গোপনে রাস্তা চিনিয়া লওয়াই ইহাদের অভিপ্রায় এবং কৃত-কার্য্য হইলে একটা বিপুল বাহিনীকে পথ দেখাইয়া চালিত করিবে।

এখন বালক এমন উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠিল যে পল্লীবাসিগণ চকিত হইয়া মনে করিল কেহ তাহাকে মারিয়াছে। সকলে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া তাহার নিকট দৌড়িয়া আসিল এবং তাহার নির্দ্দেশানুসারে দেখিল যে শত্রুসৈন্য দলে দলে অগ্রসর হইতেছে—প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের ওষ্ঠ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং ঝড়ের ন্যায় এই বিপদবার্ত্তা গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। পাড়ায় পাড়ায় অলিতে গলিতে সর্ব্বত্রই রব উঠিল - "অস্ত্র ধর, অস্ত্র ধর গো"। গ্রামবাসিগণ হাতের কাছে যাহা কিছু অস্ত্র পাইল তাহাই লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল। কাস্তে কোদাল কিছুই বাকী রহিল না।

স্পেন সৈন্য নিশ্চিন্তভাবে আসিতেছিল; হঠাৎ গ্রামের লোককে এই অদ্ভুত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আক্রমণোদ্যত দেখিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত স্তম্ভিত হইল। পরক্ষণেই উভয় পক্ষের বিকট হুঙ্কার অশ্বের হ্রেষা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা অদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-কন্দরে এবং কত মাতা কত ভগিনী কত স্ত্রীর ভগ্ন হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

শত্রুদলের একজন ফ্রাঁসোয়ার পিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিয়াছিল—ফ্রাঁসোয়ার চক্ষে তাহা পড়িল। তৎক্ষণাৎ একজন অশ্বারোহীর কটিতট হইতে সে একখানা তরবারি তুলিয়া লইল এবং পলকের ভিতর লক্ষ্যকারীর মণিবন্ধে এমন এক খোঁচা দিল যে তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। সে তখন ফিরিয়া ফ্রাঁসোয়ার প্রতি আপন সঙ্গীন উঠাইল, এমন সময়ে পিতা তাহাকে নিহত করিলেন।

বিপক্ষবর্গ সংখ্যায় তত অধিক ছিল না, গ্রামবাসিগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইল। সেই ধর-

বার অস্ত্রের তাড়নায় তাহারা অনেকে মরিল; যে বাঁচিল সে পলাইতে পথ পাইল না। গ্রামবাসিগণ ফ্রাঁসোয়াকে স্কন্ধে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে যেখানে শঙ্কাবিহ্বল রমণীবৃন্দ সারি দিয়া দাঁড়াইয়া মিনিটে মিনিটে চক্ষু মুছিতেছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বলালোকে গৃহচূড় সকল জ্বলিতেছে, তরুশাখে বসিয়া বিহঙ্গদল শীষ দিতেছে। মাতা দেখিলেন পুত্রের গণ্ডদ্বয় অরুণরাগাপেক্ষা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বাৎসল্য ভরে বারংবার পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন।

এই সাহসী বালকই কালক্রমে একজন প্রধান স্বদেশ হিতৈষী এবং রাজনীতিক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। আজিও ফ্রাঁসোয়া আরাগোর নাম ফরাসী দেশে গৌরব ঘোষণা করিয়া থাকে।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সম্রাটের সমাধি।—হায়! আজ বৎসরের প্রথমেই এ কি দৈব দুর্ব্বিপাক! ভারতের অধীশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড হঠাৎ পরলোকে গমন করিলেন; ভারতের ভাগ্যে ইহা যে বড়ই অমঙ্গলের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। সম্রাটের আকস্মিক পরলোক গমনে তাঁহার রাজভক্ত প্রজাগণ সকলেই শোকসন্তপ্ত—নীরবেই দুঃখে বিষাদে কাঁদিয়া পরিপ্লুত; অদৃষ্টবাদী হিন্দু মৃত্যুকে স্বকর্ম্মফল ভোগের কারণ ভাবিয়া তাহার সদ্গতি দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; সকলেই সেই দিন তাঁহার পারত্রিক উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে ২০শে মে শুক্রবার আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ শোকাচ্ছন্ন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সমাধির দিন। আজ সেই মহামহিমান্বিত, সর্ব্বজনপ্রিয় আদর্শ নরপতির প্রাণহীন বরবপু সমাহিত হইবে। বিধাতার সনাতন নিয়মে পরমাত্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, আর পঞ্চ-ভূতাত্মক ক্ষণভঙ্গুর জড়দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। আজ পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিবে, সেই জড়দেহের বিনাশ হইবে। যাঁহারা প্রকৃত বন্ধু তাঁহারাই এই অন্তিমকালে এই মহামুহূর্ত্তে মৃতের আত্মার সদ্গতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাই আজ জগদ্ব্যাপী প্রার্থনার রোল উঠিয়াছে। শোকাশ্রুতে ধরা প্লাবিত হইতেছে। সম্রাটের ভক্ত ভারতীয় প্রজাগণ—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, ধর্ম্মগত ও জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া, হিংসা দ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত করিয়া শোকবিভ্রান্ত হৃদয়ে সম্রাটের আত্মার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সেই মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার শ্রীচরণে সকরুণ প্রার্থনা করিতেছে।

হিন্দুর অন্তিমকালে “হরিনাম” ভিন্ন আর সম্বল নাই। হরিনামই তাহাদের ভব পারের ভেলা। তাই রাজভক্ত হিন্দু প্রজাগণ দলে দলে

প্রাণ খুলিয়া মহা সংকীর্ত্তন করিয়া সম্রাটের মহামুক্তির পথ প্রসারিত করিতেছে। শত শত কণ্ঠনিঃসৃত হরিনামের, খোল করতাল ধ্বনি জঙ্গম, ছাপাইয়া নীলাম্বর ভেদ করিয়া অনন্তধামে পৌঁছিতেছে। আহা!, অপরাহ্নে গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিকটে কি দৃশ্যই দেখিলাম। আর এক দিন স্বর্গীয়া মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে আর একদিন গড়ের মাঠে এইরূপ দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। উচ্চপদস্থ সাহেবগণও হিন্দুর এই বিরাট অনুষ্ঠান বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে অবলোকন করিতেছিলেন। তাঁহারাও জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন। মান, অভিমান, উচ্চনীচ জ্ঞান, বিদ্বেষ সব তিরোহিত হইয়াছিল। সকলের মুখে সমবেদনা ও শোক প্রকাশ পাইতেছিল। সভাস্থলে দ্বারবঙ্গের মহারাজ, বর্দ্ধমানের মহারাজ, কুমার মন্মথ নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মতিলাল ঘোষ, মিঃ আর, এন, মুখার্জি, অনারেবল শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর, মিঃ জে, চৌধুরী, রায় কিশোরী লাল গোস্বামী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীত সমাজ হইতে একটি বিরাট মিছিল বাহির হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রথমে একখানি গাড়ীতে সম্রাটের প্রকাণ্ড চিত্র অঙ্কিত করিয়া—তাহা পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইয়াছিল। মিছিল মনুমেণ্টের প্রাঙ্গণের নিকট পৌঁছিলে পর, দ্বারবঙ্গের মহারাজ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নগ্নপদে সভাস্থলে গমন করেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ দ্বারবঙ্গের মহারাজের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। মনুমেণ্টের পশ্চিমে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে জনতা ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

উদীয়মান কবিরাজ। গুণের আদর সর্ব্বত্র এই কথার যথার্থতা প্রমাণ করিবার জন্য আজ আমরা আলোচনার পাঠকবর্গকে একটি উদীয়মান নবীন কবিরাজের পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছি। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন মহাশয় আজ বহুদিবস হইতে হাওড়া জেলায় কবিরাজী ঔষধালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছেন। ইংরাজীতে একটী প্রবচন আছে Quality must be valued গুণ থাকিলে সময়ে তাহার উন্নতি হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। উক্ত কবিরাজ মহাশয় অতি সামান্য অবস্থা হইতে হাওড়ার ন্যায় বহু গুণী ও জ্ঞানী চিকিৎসক অধ্যুষিত সহরে আপন প্রতিভা বলে বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কবিরাজের বেশ ব্যুৎপত্তি আছে—মফস্বল হইতে সমাগত রোগিগণকে তিনি বিশেষ যত্ন ও সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিয়া অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়াছেন। কুষ্ঠ ও দুষ্টদুষ্ট চিকিৎসায় কবিরাজ মহাশয় যেরূপ

কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন, এরূপ বোধ হয় অপর কোন কবিরাজে পারিবেন কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে তিনি এক প্রকার দৈব শক্তিসম্পন্ন. সিদ্ধহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন—তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার অমায়িকতা গুণে মোহিত হইয়াছেন; তিনি গুণী জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান। এই অতি সামান্য অবস্থা হইতে ভগবান তাঁহাকে উন্নতিমার্গে সমাসীন করিয়াছেন—একদিন সামান্য অর্থের জন্য যাঁহার সংসার চলা দায় হইয়াছিল। আজ তিনি খাঁওড়া ও কলিকাতা সহরে তিনটী ঔষধালয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা। কলিকাতা ১০৯নং হ্যারিসন রোডে—তাঁহার সুবিস্তৃত ঔষধালয় স্থাপিত, ১০২নং থুরুট রোডে হাওড়ায় তাহার আদি ঔষধালয়; তদ্ব্যতীত আর একটী সুবিস্তৃত ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন—এখানে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় তৈল, ঘৃত, আসব এবং ধাতুঘটিত ঔষধাদি কবিরাজ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে। মধু অভাবে গুড় দিয়া তিনি কোনও ঔষধ প্রস্তুত করেন না—এইজন্য তাঁহার ঔষধ আশু ফলপ্রদ। আমরা হাওড়া ও মফঃস্বলবাসী বন্ধুগণকে আবশ্যক হইলে একবার কবিরাজ রামপ্রাণ শর্ম্মার নিকট চিকিৎসিত হইতে অনুরোধ করি।

মেসিয়া ফারমাসী—আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া সে দিন ৭৩নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে উক্ত ঔষধালয় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রসিদ্ধ পাইকারী এবং খুচরা ঔষধ বিক্রেতা মিঃ আবদুল গণি ইহার প্রতিষ্ঠাতা, ঔষধালয়টী বেশ সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত; নানাবিধ নয়ন মনোহর বোতলে সুশোভিত, দেখিলে বড় বড় ইংরাজী ডাক্তারখানা বলিয়া ভ্রম হয়—ইহাদের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। বহু কম্পাউণ্ডার বন্দোবস্ত থাকায় ক্রেতাগণকে কোন প্রকার কষ্ট পাইতে হয় না ঔষধ চাহিবা মাত্রই তাহা পাওয়া যায়। ইহারা সকল প্রকার ঔষধের আমদানী কারক বলিয়া সকল প্রকার ঔষধই যে টাটকা তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বহুদর্শী এসিসটেণ্ট-সার্জ্জন ডাক্তার সত্য শরণ মৈত্র মহাশয় সন্ধ্যা এবং সকালে রোগীদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আমরা এই ঔষধালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি—এবং সহর ও মফঃস্বলস্থ ক্রেতাগণকে একবার ইহাদের নিকট ঔষধ ক্রয় করিতে অনুরোধ করি।

হেলীর ধূমকেতু।

—:০:—

কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে ধূমকেতুর উদয় সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। ধূমকেতুর উদয় জগতের পক্ষে অমঙ্গলকর, পৃথিবীর পার্শ্ব দিয়া তাহার পরিক্রমণ জনপদধ্বংসের সূচনা মাত্র। এই কারণে পৃথিবীর সকল অংশের অধিবাসিবর্গই ধূমকেতুর উদয় ও অস্তের বিষয় চিন্তা করিয়া বিহ্বলচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে ধূমকেতুর গতিনির্ণয় ও ফটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্যই বিজ্ঞগুণী ব্যস্ত ছিলেন, আর আমাদের এই ভারতে

অনুষ্ঠানাদী বিন্দুর দেশে, সর্ব্বদেইশ শস্যহানি, প্রজাহানি, নানাবিধ দৈবদুর্বিপাকের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়াছিল।

গত বৈশাখ মাসের প্রথম হইতেই একটা জনরব পরিব্যাপ্ত হয় যে, হেলীর ধূমকেতু পৃথিবী ভেদ করিয়া যাইবে; তাহার সংস্পর্শে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইবে; ফলে সেই বায়ু সেবন করিলে মানবের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে। ফরাসী জ্যোতিষী কামিল ফ্লামারিয়ন ৪৫ মাস পূর্ব্বে সমাচার দেন যে ১৮ই মে তারিখে ধূমকেতুর শিরোদেশটি পৃথিবী হইতে এক কোটি অষ্টষট্টি লক্ষ ছচল্লিশ হাজার মাইল দূরে থাকিবেন। ইহার পুচ্ছের পরিমাণ তিন কোটী হইতে পাঁচ কোটী মাইলের মধ্যে। কাজেই সে মাসের মধ্যভাগে ধূমকেতুর পুচ্ছের তেজে জীবক্ষয় ঘটিবে।

শুধু ইহাই নহে, হাঙ্গেরী দেশের নাগিসেণ্ট কাইরুস নামক স্থান হইতে এই সময়ে সংবাদ আসে যে তত্রত্য-জনগণের বিশ্বাস পৃথিবী রসাতলে যাইবেই। তাহাদের ধর্ম্মযাজকও এই বিশ্বাস তাহাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। সকলে তখন একনিষ্ঠ হইয়া স্থির করিল যে যখন মরিতেই হইবে, তখন গৃহাভ্যন্তরে অট্টালিকা চাপা পড়িয়া মরিব কেন? এই ভাবিয়া তাহারা উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইল এবং মরণের পূর্ব্বে একবার মনের সাধে সুখাদ্য আহারের অভিপ্রায় করিল। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। সকলে আকাঙ্খা মিটাইয়া অত্যধিক পরিমাণে সেই সকল দ্রব্য আহার করিল। শেষে রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা দেখিল যে পৃথিবীর ভাগ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তবে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

যাহা হউক, ধূমকেতুর আবির্ভাব যে মঙ্গলজনক নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই হেলীর ধূমকেতু খৃষ্টের জন্মের ২৬১৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে এ পর্য্যন্ত যতবার উদয় হইয়াছে, ততবারই যুদ্ধবিগ্রহ, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, মহামারী প্রভৃতি বিপৎপাত হইয়াছে। হেলীর ধূমকেতুর কয়েকবার উদয়ের ইতিহাস এইরূপ :—২৯৬ খৃষ্টাব্দে ডায়ো ক্লিটিয়ানের আদেশে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ধ্বংস; ৩৭৪ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার বিদ্রোহ ও রোমক শক্তির বিলোপন তাহার পর ৪৫১, ৫৩০, ৬০৭, ৬৮৪, ৭৬০, ৮৩৭, ৯১১, ১০৬৬, ১১৪২, ১২২২, ১২৯৯, ১৩৭৭, ১৪৫৬, ১৫৩১, ১৬০৭, ১৭৮২, ও ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ধূমকেতুর উদয় হয়। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব ভারতে ইংরাজ অধিকার বিস্তার করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনে বিদ্রোহ হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইয়াছে, আর কোন দেশে কিছু হইয়াছে বা হইবে কি না, তাহা জানা যায় নাই।

যাহা আসিয়াছিল, তাহা এখন কাটিয়া গেল, ১৮ই মে তারিখে হেলীর ধূমকেতুর পুচ্ছ পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিল। এখন আবার ৭৭ বৎসর কাল আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। পরে আবার এই ধূমকেতুর উদয় হইবে।

ক্রটী স্বীকার।—বিগত ১২ই বৈশাখ সম্পাদক মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পরলোক গমনে ও অন্যান্য দৈব দুর্বিপাকে এবার আলোচনার প্রকাশে যার পর নাই বিলম্ব হইয়াছে, এবং প্রুফ সংশোধনেও নানাবিধ ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, গ্রাহক ও পাঠকগণ তজ্জন্য মার্জ্জনা করিবেন।



ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ।

প্রার্থনা।

—ঃ•ঃ—

প্রভু তোমারি চরণ করিয়া স্মরণ
ছুটিয়াছি উদাসীন;
বিশ্বের দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া
শত বেদনায় মর্ম্ম চিরিয়া,
ঘন অন্ধকারে হৃদয় ঘিরিয়া
চলিয়াছি দিশেহীন;
ওগো চরণ পরশে ফুল্ল হরষে
তোমাতে করগো লীন।

যদি যাতনা পীড়িত শঙ্কা জড়িত
হৃদয় আমার দলি'
সজীব জাগ্রত উদাস বাসনা
মিলাইয়া দেয় কঠোর সাধনা,
জাগায় নিমেষে নব-আরাধনা,
পুণ্যে আমার ছলি;
তবে তোমারি ইঙ্গিতে, নূতন সঙ্গীতে
পরাণে দিয়গো ঢালি।

আমি হিংসা দ্বেষ যত গ্লানি শত শত
ভুলিয়া যাইব মিতি,
হাসি কান্নাময় বিষাদ বেদন—
শৈশব, সুহৃদ, পূর্ণ-আয়োজন,
ঘৃণা অবসাদ, চির নিকেতন
ভুলিব জগত-রীতি;
তুমি আকুল আহ্বানে সুমধুর তানে
তুলিও নবীন গীতি।

বিভো তোমারি করুণা স্নেহ-সুধা-কণা
জগতের বুকে থাকি'
করুক আমার হৃদি সুকোমল
সহজ সরল চারু সুশীতল,
তোমারি প্রেমেতে অবশ-বিফল
পুণ্য-পরশ মাখি';
হরি দীন-মলিনতা শুষ্ক কপটতা
দাওগো চরণে ঢাকি'।

শ্রীভুবন মোহন দত্ত।

ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সমাজ।

— :: —

মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক জীব। সমাজ ব্যতীত মানুষ কখন মনুষ্যত্ব লাভে সক্ষম হইতে পারে না। এক কথায় সমাজ মানবত্ব বিকাশের অপরিহার্য্য আশ্রয় (indispensable condition) মানুষকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কখন কল্পনায় আনিতে পারা যায় না। কি সভ্য, কি অসভ্য সকল অবস্থাতেই মানুষ কোন না কোনও প্রকার সমাজবদ্ধ থাকিবেই থাকিবে —সমাজ-বিহীন হইয়া থাকা কখন মানবের স্বভাব-সিদ্ধ নহে। এই জন্য সমাজ-বন্ধন মানবের নিকট, বিশেষতঃ হিন্দুর নিকট, বড়ই আদরের জিনিস। আজকাল এই সমাজ-বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে বলিয়াই আমাদের দেশে এত দৈব-দুর্বিপাক, এত গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। দেশবাসী এতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ঘোর অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে। এক দিন এই যে অপ্রতিহতবল হিন্দু সমাজ রাজার রাজদণ্ডকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিত, যাহার নিকট প্রত্যেক হিন্দু এমন কি রাজা হইতে পর্ণকুটিরবাসী পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করিত, আজ তাহার এ দুর্দ্দশা কেন হইল, কেন আজ হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার, নিয়ম প্রণালী সেই হিন্দুর নিকট উপেক্ষিত হইতে বসিয়াছে? বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ ব্রাহ্মণের অধঃপতন হইয়াছে বলিয়া, সমাজ ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। আজকাল ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ নাই বলিয়াই দেশের ও সমাজের ঘোরতর দুর্গতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে—তাহা কে না স্বীকার করিবে? দেব-সদৃশ ব্রাহ্মণগণের অবনতিই হিন্দুসমাজের অবনতির মূল কারণ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। হায়! ঘোরতর অধঃপতন!

ব্রাহ্মণ শব্দের গুরুত্ব—ইহার আভিধানিক ব্যাখ্যা যখন ভাবি—তখনই যেন একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হই, মনে করি আমরা কি সেই ব্রাহ্মণ, সেই আর্য্য-প্রভাব-বিশিষ্ট-ঋষিবংশ সম্ভূত? আজকাল এই কলিযুগে—এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মণগণের দুর্দ্দশা দেখিলে কাহার হৃদয় না বিচলিত হয়? কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি অধুনা বিপ্রগণের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন! যে বিপ্রগণের জ্ঞানই প্রাণস্বরূপ ছিল, ত্যাগই যাহাদের প্রধান শিক্ষা মধ্যে পরিগণিত হইত, আজ সেই বিপ্রগণ সামান্য উদরান্নের জন্য পরের দাসত্ব করিতেছে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর বিলাসিতায় মত্ত হইয়াছে। ওহো কি দুর্দ্দৈব, কি ভীষণ পরিণতি!

যে ব্রাহ্মণগণ এককালে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ও অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, হিন্দুসমাজ যাঁহাদের নিয়ম প্রণালী অমান্য করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে পারিত না। যাহাদের অমিত-তেজঃ-প্রভাবে প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণ সশঙ্কচিত্তে চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিতেন এবং প্রত্যক্ষ-দেবতা জ্ঞানে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যাহাদের পাদার্চ্চনা করিতেন—এখন তাহাদের এরূপ

হীনাবস্থা দেখিলে হৃদয় কি শতধা বিদীর্ণ হয় না?

আজকাল শিক্ষিত সমাজ সেই জ্ঞানের আধার স্বরূপ, ত্যাগধর্ম্মের জাজ্জ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণকে ঘোর স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করেন। তাঁহারা বলেন ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে বড়ই স্বার্থপর ছিল নতুবা শাস্ত্র ব্যবসা, পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কেবল তাঁহাদেরই নিজস্ব ছিল কেন, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিতে আর কাহারও অধিকার ছিল না কেন? পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃত-মস্তিষ্ক, ধর্ম্মদ্রোহিগণকে আমরা বলি, ব্রাহ্মণগণ কখনই স্বার্থপর ছিলেন না, তাহা হইলে—তাঁহারা চর্ব্বচোষ্য লেহ্য, পেয় প্রভৃতি আহারের পরিবর্ত্তে অপক্ক কদলী ও আতপ-তণ্ডুল প্রভৃতিতে সন্তুষ্ট হইতেন না—কটু কষায় লাভে যারপর নাই তৃপ্তি অনুভব করিতেন না, মণি-কাঞ্চন, মুক্তা, প্রবাল ত্যাগ করিয়া কখন গৈরিক-রঞ্জিত-বসন ও রুদ্রাক্ষ মালায় কিম্বা কৌপিন পরিধানে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন না, অগুরু চন্দন ছাড়িয়া চিতাভস্ম বিলেপনে কখন প্রফুল্লচিত্ত হইতেন না, সুধা-ধবলিত সুরম্য হর্ম্মতলে মহামূল্য সুকোমল শয্যা ছাড়িয়া শ্মশানভূমিতে বৃক্ষতলে অথবা শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন কাননে পর্ণ-শয্যায় শয়ন করিয়া কখন অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা তাঁহাদিগকে ঘোর স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করেন—তাঁহারা মানবাকারে পশু ভিন্ন আর কি বলিব?

যখন ব্রাহ্মণগণ এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন—যখন তাঁহারা আজীবন ধর্ম্ম কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন, তখনই দেশে সুখশান্তি একাধারে বিরাজ করিত, তখন হিন্দু-সমাজ আপন প্রভাবে সকল সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। এখন তাহা নাই; বিপ্রগণ বিলাসিতার বশীভূত, দাসত্বে অনুরক্ত; তাই হিন্দু সমাজ দিন দিন ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে। এখন ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবলের অভাব হওয়ায় ত এত অবনতির সূত্রপাত। যখন ব্রাহ্মণ ছিল, তাঁহাদের বিধি বিধানানুসারে যখন সমাজ পরিচালিত হইত, তখন দেশে এত শত্রুতা, এত গৃহ বিচ্ছেদ এত অধর্ম্মাচরণ দেখা যায় নাই।

আজ কাল ব্রাহ্মণগণের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াই দেশের ও সমাজের এত অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। এক্ষণে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিতে হইলে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণকে সংস্কৃত করা, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মপথে পরিচালিত করা একান্ত আবশ্যক, নতুবা এই পতিত সমাজের উন্নতির আর অন্য উপায় নাই।

অনেকে হয়ত বলিবেন ব্রাহ্মণ যেরূপ অধঃ-পতিত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই। কথাটা অনেকটা সত্য হইলেও দেশে ধর্ম্ম-শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইলে এখনও তাঁহারা নিজ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। ইহাতে রাজার সহায়তা একান্ত আবশ্যক, সমাজ ও ব্রাহ্মণজাতির পুনঃসংস্কার করিতে হইলে, শিক্ষা প্রণালী ভিন্ন ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। রাজার সাহায্য না হইলে ইহা কেবল প্রজা শক্তির দ্বারা

সংসাধিত হইতে পারে না। হিন্দু সমাজ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলে রাজার তাহাতে যে সমূহ উপকার সাধিত হইবে—তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। আজকাল দেশে যে এত অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া রাজা ও প্রজাকে সতত সন্ত্রাসিত করিতেছে। দেশে এত চৌর্য্য, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইতেছে—তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল ধর্ম্মহীনতা, হিন্দুর সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই দেশে এত অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের দ্বারা হিন্দু-সমাজ পুনরায় সংরক্ষিত হইলেই সকল অশান্তির উপদ্রবের মূল উৎপাটিত হইতে পারে, ইহাই আমাদের ধারণা। সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও সংস্কার করিতে হইবে, অধুনা আমাদের সমাজে যে ভাবে বালক বালিকাগণকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা হিন্দু স্বভাবের প্রতিকূল না হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অনুকূল নহে। সাত্ত্বিক প্রকৃতি, হবিষ্যান্নভোজী হিন্দুর পক্ষে আধুনিক শিক্ষা প্রণালী যে ঘোর অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে—তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিলেই প্রতীয়মান হইবে।

এখনও সময় আছে, এ দারুণ দুর্দ্দিনেও হিন্দু সমাজ সকল সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এখন যাহা কিছু আছে তাহা আর কোন সমাজে নাই। হিন্দুর সমাজরূপ মহা অট্টালিকার বালি চূণ খসিয়াছে, ভিত নামিয়াছে, খিলান ফাটিয়াছে কিন্তু বনিয়াদ পাকা বলিয়া আমাদের এত অত্যাচারেও ইহা ভূমিসাৎ হয় নাই, সংস্কার করিলে এখনও ইহা পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। তাই বলি আগে সমাজ রক্ষা কর, সমাজের নেতা বিপ্রগণকে আবার ধর্ম্মকর্ম্মে, সনাতন আর্য্য-শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিতে দাও। ধর্ম্মের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মকার্য্যে জলাঞ্জলি দিলে হিন্দু-সমাজের এবং হিন্দু-জাতির কখনই উন্নতি হইবে না। সমাজ ও ধর্ম্মহীন মানব পশু তুল্য, এই জন্য Aristotle বলিয়াছিলেন—যাহারা সমাজ ছাড়িয়া বাস করে—তাহারা মানুষ নহে—তাহারা হয় দেবতা না হয় পশু। আমরা সমাজ ছাড়িয়া পশুত্বই প্রাপ্ত হইতেছি, দেবত্বের ভাণ করা আর আমাদের সাজে না।

আজ কাল সামাজিক শাসন না থাকায় হিন্দু আচারভ্রষ্ট হইতেছে, যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে, কেহ বলিবার নাই। হায়! আজ ব্রাহ্মণগণের দোষেই সনাতন ধর্ম্ম ও পবিত্র হিন্দু-সমাজের এরূপ দুরাবস্থা হইয়াছে। বিপ্রগণ! তোমাদের দোষে আজ তোমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম্ম ও সমাজের অবস্থা দর্শন কর, তোমরা ক্রমশঃ কি ভয়ানক অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছ, একবার স্থির চিত্তে ভাব দেখি। তোমাদের সেই দেবোপম সৌম্যমূর্ত্তি কোথায়, সেই তপ্ত কাঞ্চন সদৃশ বরবপু আজ কেন বিকৃত হইয়া যাইতেছে? যাহারা সদাই আনন্দিত, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া যাহাদের হৃদয় প্রফুল্ল, আজ তাহাদিগকে বিশুষ্ক মুখে, নিতান্ত স্ফূর্ত্তিহীন দশায় দর্শন করিলে কাহার হৃদয় না ব্যথিত হয়—হায়! তোমরা নিজে মজিতেছ, তোমাদের দোষে সমাজও হীনবল হইয়া পড়িতেছে;

তোমাদেরই না ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ ঃ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

তবে ভাই! কোন্ পথে যাইতে, কোন্ পথে যাইতেছ? নিজের জিনিস ছাড়িয়া কেন পরের ধনে ধনী হইতে ইচ্ছা করিতেছ? মুক্তার পরিবর্ত্তে শুক্তির আদর করিয়া ফল কি? তাহাতে তোমার শ্রেয়ঃ লাভ হইবে না, কেবল দিন দিন আত্মনাশ করিয়া শেষে আপনহারা হইয়া পাপভাগী হইবে, তোমাদের দুর্গতির একশেষ হইবে। তুমি যদি ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হই। ধর্ম্মের সহিত একত্ব সম্পাদন করিতে পার, যদি জ্ঞান-ধর্ম্মে আবার তোমরা সেইরূপ উন্নতি লাভ করিতে পার, যদি সেইরূপ অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনাদের মহিমা বজায় রাখিতে পার, তাহা হইলে চুম্বকে লৌহ আকর্ষণের ন্যায় আবার সমস্ত আপনার আয়ত্তাধীন করিতে পারিবে। হিন্দু সমাজ আবার তোমার করতলগত হইবে, আবার তোমার ইঙ্গিত মাত্রে হিন্দু সমাজের আবালবৃদ্ধ-বনিতা একসূত্রে গ্রথিত হইয়া হিন্দুর জয় ঘোষণা করিবে। আজ যে দেশের এত দুর্গতি দেখিতেছ, আজ যে আমরা এত মর্ম্ম-পীড়িত, এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, শোকে, রোগে, জর্জ্জরিত, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, এ সমস্ত তিরোহিত হইবে। যদি হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, তবে দেশে আবার সুদিন আসিবে, আবার আমরা মুখ দেখিয়া হাস্য-আস্যে বেড়াইব সমাজ, তোমাদেরই মুখাপেক্ষী, তোমরা যদি সমাজকে রক্ষা কর, যদি তোমরা পুনরায় আপনার ঘরে ফিরিয়া তাহাকে বজায় রাখিতে চেষ্টা কর, তবে ইহা থাকিবে, তবেই ইহার উন্নতি হইবে। ধর্ম্মচ্যুত হিন্দু আবার ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান হইয়া সমাজের বিধি বিধান মানিয়া চলিবে, নতুবা এ সমাজের উন্নতির আর উপায় নাই। তোমরাই আদর্শ, তোমাদের আদর্শেই হিন্দু সমাজ গঠিত, তোমরাই যদি ধর্ম্ম-হীনতায় প্রশ্রয় দিতে লাগিলে, তোমরাই যদি অহরহঃ পাপকার্য্য অকুণ্ঠিত-চিত্তে সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তবে অপরে আর কাহার দেখিয়া চরিত্র-গঠন করিবে। সুবর্ণ কর্দ্দমাক্ত হইলে তাহার সুবর্ণত্ব তিরোহিত হয় না, সংস্কার করিলেই কাঞ্চনের সুবর্ণত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সুবর্ণত্ব সংসাধিত হয়। নিজ দোষে তোমরা কর্দ্দমাক্ত হইয়া জ্যোতিঃহীন হইয়াছ, কার্য্য করা সংস্কৃত হইতে চেষ্টা কর, আবার সিংহশিশু সিংহের মতই তেজঃপুঞ্জ হইবে। তোমাদের গুণে আমার হিন্দুর মুখোজ্জ্বল হইবে, দেশেরও উন্নতি হইবে, ধর্ম্মের সুদিন আসিয়া আবার পুণ্য-পূত প্রবাহে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্র প্লাবিত করিবে।

আং সং

———

দস্যুদলন বা অদ্ভুত গোয়েন্দা।

—•:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সঙ্কল্প।

"শয়তানকে হত্যা কর, তুমি যা বলবে, তাই শুনব।"

ভাগীরথী তীরে নয়াসরাই গ্রামের সান্নিধ্যে পূর্ব্বে এক ভীষণ জঙ্গল ছিল। মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে বঙ্গদেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, এই জঙ্গলের চারিদিকে সেই অরাজকতার ভীষণা মূর্ত্তি সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইত। জঙ্গলের পূর্ব্বভাগ দিয়া একটি রাস্তা গিয়াছে; আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, যে সময়ে দিবাভাগেও কেহ এই রাস্তা দিয়া একাকী যাইতে সাহস করিত না। এই স্থানে সে দস্যুভীতি ছিল, একথা কাহারও মুখে পরিশ্রুত হইত না; লোকের ধারণা ছিল যে এই স্থান প্রেতভূমি—এই জন্য এই জঙ্গলকে প্রেতবন বলিত।

এই প্রেতবন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে একক্রোশব্যাপী। বড় বড় তাল, নারিকেল, বাবলা, বেলগাছের ছায়ায় প্রেতবন সর্ব্বদাই অন্ধকারময় হইয়া থাকিত। স্থানে স্থানে দুই একটী বাঁশঝাড় ছিল; সামান্য পবনে তাহার শন্ শন্ শব্দে পথিকের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিত। লোকে ভাবিত জঙ্গলে প্রেতের নৃত্য হইত, কিন্তু তথায় প্রেতের বসতি ছিল কি না বলা যায় না—কিছুকাল পরে জানা গিয়াছিল যে, প্রেতবনে একদল দস্যু বাস করিত।

প্রেতবনের মধ্যস্থলে দস্যুদিগের একটি একতলা বাড়ী ছিল; এখন এই জঙ্গলও নাই, বাড়ীও নাই; তবে এখনও দুই এক হাত মৃত্তিকার নিম্নে ভগ্ন ইষ্টকের রাশি দেখিতে পাওয়া যায়। দস্যুদিগের এই বাসস্থানের বাহ্য পরিপাট্য ছিল না। গৃহের এক একটি কুঠারী সুসজ্জিত ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দস্যুরা ঐ বাটীতে বাস করিত না, কিন্তু গৃহের সাজসজ্জা প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় ছিল।

এই বাড়ীর একটি সুসজ্জিত কক্ষে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে, তাহাতে বাতি জ্বলিতেছে। দেওয়ালের চারি ধারে সুবৃহৎ আয়না আঁটা আছে, তাহাতে আলোকের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতেছে। কক্ষের এক প্রান্তে পালঙ্ক, তাহার উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। অপর দিকে একটি গোলাকার টেবিল, তাহার উপর কয়েকটি রৌপ্যপাত্র সজ্জিত রহিয়াছে। টেবিলের উপর বাম হস্তটি ন্যস্ত করিয়া এক সর্ব্বাবয়বভূষিতা, রূপলাবণ্যসম্পন্না যুবতী দাঁড়াইয়া আছে; যুবতী কি ভাবিতেছে।

পালঙ্কের উপর বসিয়া ত্রিশ বৎসরের একটি যুবা দীপালোকে যুবতীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। যুবতী চিন্তায় আত্মবিস্মৃতা; যুবক পৃথিবীর সার-সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ। উভয়েই নীরব। সহসা যুবতী বলিল, "শয়তানকে হত্যা কর, তুমি যা বলবে, তাই শুনব।"

"কা'র কথা বলিতেছ লতা" ?—যুবতীর নাম স্নেহলতা।

"কার কথা তা এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছ"? আজ গঙ্গার ঘাটে যাহাকে দেখিয়াছ, আমি তাহারই কথা বলিতেছি।"

যুবক বিস্মিত হইল; যুবতীর মনোগত ভাব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—কথার উত্তর দেওয়া হইল না।

যুবকের বিস্ময় দর্শনে স্নেহলতা বলিল—"তুমি বিস্মিত হইতেছ! মনে করিতেছ যে প্রণয় সম্ভাষণের অবসর পাইয়া কোথায় প্রাণের আবেগে দুটা মধুর কথা বলিবে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তোমাকে নরহত্যার পরামর্শ করিতে হইতেছে। কি করিবে বল—যদি আমাকে চাও, তবে তাহাকে হত্যা করিতেই হইবে। আমার কথাটা কি বুঝিতেছ?"

যুবক স্নেহলতার মুখে এরূপ কথা শুনিবে, এ আশঙ্কা করে নাই। দুই দিন পরে অবসর পাইয়াছে, কোথায় স্নেহলতার সৌন্দর্য্যদর্শনে আত্মবিস্মৃতির কথা বলিবে, না তাহার পরিবর্ত্তে স্নেহলতার সম্মুখে তাহাকে নরহত্যার সংকল্প করিতে হইবে। যুবক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল; তাহার হস্তপদ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল; সে শ্বাসপ্রশ্বাসে ভার বোধ করিতে লাগিল।

যুবককে নীরব থাকিতে দেখিয়া স্নেহলতা বলিল—"ছি! তুমি না পুরুষ! তুমি না সাহসের অহঙ্কার কর? শোন সুকুমার, আমি আবার বলিতেছি, যদি আমাকে চাও, তাহাকে হত্যা কর।"

স্নেহলতার চক্ষু জলিয়া উঠিল; শেষ কথা বলিয়া সে বাহিরে যাইতেছিল, সুকুমার তাহার গমনে বাধা দিয়া বলিল, "লতা, তাকে তুমি জান?" সুকুমারের কথা গলায় বাধিতে লাগিল।

"জানি। না জানিলে তাহাকে হত্যা করিতে বলিব কেন?"

"সে কি তোমার শত্রু?"

"শত্রু! পরম শত্রু।—সে জীবিত থাকিলে আমি বাঁচিয়া সুখ পাইব না। আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য, এই অতৃপ্ত যৌবন রসাতলে যাইবে। হত্যা কর—বল হত্যা করিবে?

এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে স্নেহলতা বাঁচিয়া সুখ পাইবে না—তাহার ঐশ্বর্য্য, যৌবন রসাতলে যাইবে—কথাটা শুনিয়া সুকুমারের রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। সুকুমার আর একবার লক্ষ্যশূন্য দৃষ্টিতে যুবতীর বদন নিরীক্ষণ করিল।

স্নেহলতা টেবিলের উপর বসিল। বলিল, "এখনও কি ভাবতেছ?"

"আমি তাহাকে হত্যা করিব, ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়?"

"হাঁ, নচেৎ তোমাকে একথা শুনাইতাম না।"

"যদি সমর্থ হই?"

"আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব দান করিব, তোমার দাসী হইয়া থাকিব।"

সুকুমার অতিষ্ঠ হইয়া পড়িল। তাহার

হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। ঝাড়ের লম্বিত ত্রিকোণ কাচখণ্ডে দীপ-রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল—সুকুমার শুভ্রালোকের পরিবর্ত্তে কাচখণ্ডসমূহের প্রতিফলিত লাল, নীল, হরিৎ প্রভৃতি বর্ণের রশ্মি দেখিতে লাগিল। সে নিজে কাঁপিতেছিল, মনে করিল স্নেহলতাও কাঁপিতেছে।

স্নেহলতা যুবকের অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল,—"দেখ সুকুমার, পিতা জীবিত থাকিলে তোমার সঙ্গেই আমার বিবাহ দিতেন। তিনি নাই, এখন আমি স্বয়ং পাত্রনির্ব্বাচন করিব। পিতা যে তোমাকে কত স্নেহ করিতেন তাহা নহে, কিন্তু এখন তিনি নাই—সে স্নেহের দাবি আমি না শুনিতেও পারি। আমি ঐশ্বর্য্য-শালিনী, তুমি দরিদ্র—আমার ঐশ্বর্য্যের তুলনায় তুমি অতি দীন। পিতার দুই এক জন বন্ধু এখনও আমাকে দেখিতে আসেন—তাঁহারা যে তোমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন, আমি এক ভবঘুরেকে বিবাহ করিয়াছি, তাহা আমার সহ্য হইবে না। তুমি আমার কথা অনুসারে কাজ কর, তোমাকে অতুল সম্পত্তির অধিকারী করিব—তাহার পর, তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করিব।"

সুকুমারের দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। স্নেহলতা তাহা বুঝিয়া বলিল, "আমি তোমার অবমাননা করিতেছি না; আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। বোধ হয় আমার মনও তুমি জানিয়া থাকিবে। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখ উপভোগ করিতে চাই। দুর্ভাবনায় অশান্তির স্মৃষ্টি করিয়া আমার এই অতৃপ্ত জীবন কাটাইতে চাহি না। বল তুমি আমার দুশ্চিন্তা দূর করিবে।"

সুকুমার যুবতীর রূপপ্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। স্নেহলতার মুখচ্ছবি তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। সে ভবিষ্যৎ সুখের আশায় পাপপুণ্য ভুলিয়া স্নেহ-লতাকে বলিল—"আমি সংকল্প করিলাম।"

"কি সংকল্প করিলে?—সেই শয়তানকে হত্যা করিব?"

"করিব।"

"শুধু সংকল্প নয়, প্রতিশ্রুত হও।"

"প্রতিশ্রুত হইলাম।"

যুবতীর মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। প্রতি-শ্রুতির কথা শুনিয়াই স্নেহলতা বলিল, "তবে এখন বিদায় লইলাম।" যুবতী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সুকুমার আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না। পালঙ্কের উপর সেই অবস্থাতেই সে বসিয়া রহিল। স্নেহ-লতা যদি আর একবার কক্ষে প্রবেশ করে, এই আশায় সে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল—কিন্তু কেহ আসিল না, সামান্য পদশব্দও পরি-শ্রুত হইল না। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া সুকুমার উঠিল—আর একবার দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িল। পরে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। স্নেহলতা কি করিতেছে, তাহা সে জানিবারও চেষ্টা করিল না। বাটী হইতে বাহির হইয়া সুকুমার বনপথ ধরিল—ভাবিতে ভাবিতে পল্লীর দিকে চলিয়া গেল।

দস্যুগৃহের সম্মুখীন হইল। গৃহের দ্বার তখনও রুদ্ধ; সুকুমার কপালে হাত দিয়া দ্বারদেশে বসিয়া পড়িল।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। গৃহের ভিতরে দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। সুকুমার বুঝিল, স্নেহলতা উঠিয়াছে। আবার তাহার চিন্তা বাড়িয়া উঠিল। স্নেহলতার সহিত দেখা হইলে সে তাহাকে কি বলিবে, কিরূপে আপনার মতি পরিবর্তনের কথা বুঝাইবে। সুকুমারের আবার সব গোল হইয়া গেল। বলা হইবে না স্থির করিয়া সে স্থানান্তরে যাইবার জন্য উঠিল।

সেই দণ্ডে বাহির দ্বারের অর্গল খুলিয়া গেল। সুকুমার ফিরিয়া চাহিল না। স্নেহলতা সুকুমারকে দেখিয়া বিস্মিত হইল; ডাকিল "সুকুমার"।

"কেন" বলিয়া সুকুমার দাঁড়াইল। স্নেহলতা তাহাকে আহ্বান করিল। সুকুমারের যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু স্নেহলতা যখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আসিবে না"? তখন সুকুমারের মনের বল নষ্ট হইল, বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। কোন কথা না কহিয়া সুকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

স্নেহলতা বলিল, "সুকুমার, কাল তুমি গৃহে যাও নাই"?

"গিয়াছিলাম"।

"তবে এত ভোরে এখানে আসিয়াছ কেন?"

"কথা আছে, তাই আসিয়াছি।" সুকুমার স্পষ্ট বলিতে যাইতেছিল যে সে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে না; কিন্তু সে কথা তাহার অন্তরেই থাকিয়া গেল। সে বলিল, "কথা আছে তাই আসিয়াছি।"

"কি কথা সুকুমার?" স্নেহলতার নেত্রে বিজলি হাসিল; স্নেহলতার বুক কাঁপিয়া উঠিল: আবার স্পষ্ট কথা বলা হইল না। সুকুমার বলিল, আমি বড় ভাবনায় পড়িয়াছি।

স্নেহলতা মনে করিয়াছিল, যে তাহার প্রণয়ের আশায় সুকুমার চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে; গত রাত্রিতে সে সুকুমারকে যাহা শুনাইয়াছে, যে আশার আলোক তাহার নয়নের সম্মুখে ধরিয়াছে, সেই কথা সেই আলোকই সুকুমারকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। সুকুমার প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু সুকুমারের মুখে ভাবনার কথা শুনিয়া চতুরা স্নেহলতা প্রকৃত বিষয় আভাসে বুঝিল। তখন ভ্রূকুঞ্চন করিয়া বক্রদৃষ্টিতে স্নেহলতা বলিল, "ভাবনা কিসের শুনিতে পাইব কি?"

"কেন পাইবে না, তোমাকে বলিব বলিয়াই আসিয়াছি।" স্নেহলতার যে হাবভাব দেখিলে সুকুমারের আত্মবিস্মৃতি ঘটে, স্নেহলতার নেত্রে ও মুখের ভাবে তাহার পরিবর্তন হইতে দেখিয়া সুকুমার হৃদয়ে বল পাইল। সে প্রকৃত কথা বলিবার চেষ্টা করিল।

স্নেহলতা বলিল, "কি বলিবে, বল; হয় ত আমি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি।"

সুকুমার গম্ভীরভাবে বলিল,—"আমি পারিব না।"

"সে আমি বুঝিয়াছি; তোমার দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না তাহা আমি জানি। তবে তোমাকেই আমি সহায় বলিয়া মনে করি, তাই সেকথা বলিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল যে, তুমি আমাকে ভালবাস, আমার সুখের জন্য তুমি সবই করিতে পার, তাই তোমাকে বলিয়াছিলাম। তোমার ভালবাসা মৌখিক জানিলে একথা তোমাকে শুনাইতাম না।"

সুকুমার দেখিল, স্নেহলতার বদনে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। সে ভাবিল যে বুঝি সে স্নেহলতার কোমল হৃদয়ে আঘাত করিল। সুকুমারের মনের বল কমিয়া আসিল। কম্পিত-স্বরে সে বলিল,—"দেখ, তাহাকে আমি জানি না; তাহার অপরাধ কি, তাহা বুঝি না; সে কেন শত্রু, তাহা শুনি নাই—আমি তাহাকে হত্যা করিব কেন?

স্নেহলতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল; সুকুমারের কথা শুনিয়াই কোপনস্বভাবা ফণিনীর ন্যায় অঙ্গসঞ্চালন করিয়া বলিল, "তোমার জানিবার বুঝিবার শুনিবার কোন প্রয়োজন নাই, তাই তোমাকে বলি নাই। তবে তুমি হত্যা করিবে কেন, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? শোন, আমি বলিতেছি এইজন্য হত্যা করিবে।"

সুকুমারের হস্তপদ কাঁপিয়া উঠিল। স্নেহলতা আবার বলিল,—"কালু সর্দ্দার বৃথায় তোমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রয় অপেক্ষা ত্রিবেণীর টোলে তোমার আশ্রয় লওয়া উচিত ছিল। সর্দ্দার তোমাকে যত্ন করিতেন, অস্ত্রশিক্ষা দিয়া তোমাকে মানুষ করিলেন, তুমি বলিতেছ পারবে না। কাজ নাই, তুমি স্থানান্তরে যাও"। স্নেহলতা ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ত্রিবেণীর ঘাটে বসিয়া সুকুমার বালুকাস্তূপে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর বচন-পবনে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। সুকুমার বলিল, "শোন স্নেহ। আমি অকৃতজ্ঞ নহি। তুমি—"

স্নেহলতা তদ্দণ্ডেই বাধা দিয়া বলিল.—"কৃতজ্ঞার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। এখনও কথা কহিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না? আমার মত যুবতী তোমার পায়ে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তুমি আমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলে। —তাহার পর আবার তর্কের বোঝা লইয়া প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ করিতে আসিয়াছ? দেখ সুকুমার, আমি প্রতিশ্রুতি পালন করিব—যে আমার শত্রুকে নিপাত করিতে পারিবে, আমি তাহারই হইব। তোমাকে পাইলে আশাতিরিক্ত সুখী হইতাম, তা তুমি যদি অসমর্থ হও, অপরে সমর্থ হইবে—তোমার শ্রীচরণে থাকায় যে সুখ, সে সুখে না হয় বঞ্চিত হইব। পৃথিবীতে সকল সুখ মেলে না"।

সুকুমার আবার সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিল। স্নেহলতার মধুরতামিশ্রিত শ্লেষবাক্যে সে আত্মবিস্মৃত হইল। বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিয়া সে বলিল, "বেশ, আমাকে একটা কথা বুঝাইয়া বলিবে কি"?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

— ঃ•ঃ —

বালির বাঁধ।

ত্রিবেণী পূর্ব্বে সমৃদ্ধিশালী গঞ্জ ছিল। এখনও ত্রিবেণী বাণিজ্য-কেন্দ্র, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য নাই। পূর্ব্বে তীর্থক্ষেত্র ও বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধি ছিল। এখন তীর্থক্ষেত্রের জন্যই ত্রিবেণীর নাম আছে, বাণিজ্য যাহা হয়, তাহা পূর্ব্বের তুলনায় সামান্য মাত্র। সেই বড় বড় অট্টালিকা, সেই জনবহুল হাট, গঙ্গার ঘাটে সেই অসংখ্য বজরার সমাবেশ —এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ত্রিবেণীর নিকটেই নয়াসরাই নামে গ্রাম। প্রেতবনের পার্শ্বেই বড় রাস্তার উপরে একটি বৃদ্ধা একটি সরাই খুলিয়াছিল। পথিকেরা এই সরাইয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিত। কিন্তু এখনও শুনা যায় যে, এই সরাইয়ে যাহারা রাত্রিযাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে হয় পথিমধ্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইয়াছে, না হয় তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তথাপি, সরাইয়ে অবস্থান-কালে কাহারও কোন বিপদ ঘটিত না বলিয়া লোকে এই স্থানে নিঃসন্দেহে প্রবেশ করিত; বৃদ্ধার মধুর বচনে ও আপ্যায়নে পথিকমাত্রেই পরিতুষ্ট হইত।

ত্রিবেণীর ঘাটের রাস্তার যে অংশে এই নয়াসরাইয়ের রাস্তা মিলিত হইয়াছে, সেই অংশে কয়েকটি শিবমন্দির বিদ্যমান। মন্দিরের পার্শ্বে একখানি পুরাতন বাড়ী। তাহারই একটি কক্ষে বিস্তীর্ণ শয্যার উপরে সুকুমার শয়ন করিয়া আছে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই; দুশ্চিন্তায় সুকুমারের নেত্রে নিদ্রার আবেশ হয় নাই। সুকুমার কেবলই ভাবিতেছে।

ভাবনার অন্ত নাই। একবার নরহত্যার চিন্তা, একবার স্নেহলতার ন্যায় সুন্দরী যুবতী লাভের আশা, কখনও বা সেই অপরিচিত পুরুষের সম্বন্ধে নানারূপ অনুমান—এই সকলের জন্য সুকুমারের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল। প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সে শয্যাত্যাগ করিয়া ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়া বসিল।

সুকুমার আপনমনে ভাবিতে লাগিল—সে কে? সে স্নেহলতার শত্রু কেন হইবে?

সুকুমার আবার ভাবিল—যে কারণেই হউক, সে স্নেহলতার শত্রু। পরম শত্রু না হইলে স্নেহলতা তাহাকে হত্যা করিতে বলিবে কেন? কিন্তু সে স্নেহলতার শত্রু, আমার কে? আমার ত কোন অনিষ্টই সে করে নাই, তবে আমি তাহাকে হত্যা করিব কেন? স্নেহলতাকে লাভ করিতে পারিব বলিয়া? ছি! এমন কাজও করিব? নরহত্যা করিয়া রমণীর প্রেমভিক্ষা করিতে হইবে!—না, তাহা আমি পারিব না।

সুকুমারের সব গোল হইয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য স্নেহলতার সৌন্দর্য্য তাহার মানস-নয়নে সমুদ্ভাসিত হইল। সে আবার ভাবিল—পারিব না; কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুত হইয়াছি! প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ মহাপাপ! কিন্তু নরহত্যার অপেক্ষাও পাপ কি! বিনা অপরাধে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের পাপ কি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর? আমি কেন প্রতিশ্রুত হইলাম! যুবতীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ

হইয়া কেন হিতাহিত জ্ঞান হারাইলাম ? আমি আবার যাইব, স্নেহলতাকে বলিয়া আসিব, এ কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না। প্রতিশ্রুত হইব যে এ কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিব না। কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি যে ভাঙ্গিতে পারে, তাহার এই প্রতিশ্রুতিতেই বা স্নেহলতা বিশ্বাস করিবে কেন ?

সুকুমারের মনে হইল যেন স্নেহলতা তাহাকে ভৎর্সনা করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া সে মুখ ফিরাইতেছে। এ চিন্তা সুকুমারের দুঃসহ হইল। সুকুমার ভাবিল—সে আমার শত্রু নহে, কিন্তু স্নেহলতার শত্রু। সে জীবিত থাকিলে স্নেহলতার বাঁচিয়া সুখ হইবে না। তাহাকে হত্যা না করিলে স্নেহলতার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, সর্ব্বস্ব রসাতলে যাইবে। না, তাহা আমি দেখিতে পারিব না। আমি স্নেহলতাকে ভালবাসি, তাহার সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিব। আমি তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইব না, কেবল সেই ব্যক্তিকে হত্যা করিব। স্নেহলতার সুখের পথ সরল করিয়া দিব। আমি স্নেহলতার পাণিগ্রহণ করিব না, কেবল সেই শত্রুকে হত্যা করিব।

এমন সময়ে কাহারও পদশব্দে সুকুমারের চমক ভাঙ্গিল। সুকুমার চাহিয়া দেখিল, এক ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের জন্য ঘাটে অবতরণ করিতেছে। স্নানার্থীর সুন্দর গঠন, বলিষ্ঠ দেহ—নিশ্চিন্তমনে তিনি সোপানাবলী অতিক্রম করিতেছিলেন। স্নানার্থীর বয়স সুকুমারের অপেক্ষা অধিক নহে, বোধ হয় উভয়েই সমবয়স্ক। কয়েকটি সোপান অবতরণ করিয়া তিনি একস্থানে আপনার পরিধেয় রক্ষা করিলেন; সুকুমারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল না; ধীরে ধীরে তিনি জলে অবতরণ করিলেন।

সুকুমারের হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে একাগ্রচিত্তে স্নানার্থীর স্নানাদি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবকের স্নান শেষ হইল; সোপানে উঠিয়া তিনি আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; গাত্রে নামাবলী দিলেন; ধীর পাদবিক্ষেপে, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে চলিয়া গেলেন।

সুকুমার দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিল,—ইহাকে হত্যা করিতে হইবে? এমন সুন্দর গঠন, এমন প্রাতঃস্নাতা ভক্তিপরায়ণ যুবককে হত্যা করিতে হইবে? ইহার ভিতরে কলুষতা আছে বলিয়া কে সন্দেহ করিবে? আমি সন্দেহ করিতে পারিব না, আমি ইহাকে হত্যা করিতে পারিব না। দেখিলে ভক্তি হয়, ইহাকে আমি হত্যা করিতে পারিব না। আমি স্নেহলতাকে বলিব, তাহার প্রেম আমার নিকট তুচ্ছ। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য মহাপাপ হয় হউক; এ কার্য্য আমাকে দিয়া হইবে না।

সুকুমার উঠিল। গঙ্গার তীরে তীরে গমন করিতে লাগিল। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই; রাত্রির অন্ধকার তখনও অপসৃত হয় নাই, নিঃশঙ্কে সুকুমার প্রেতবনের সমীপবর্ত্তী হইল; চিন্তার তরঙ্গাঘাতে হতবল হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। সুকুমার বনপথ ধরিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছাগুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া

(২)

স্বল্পসময়ে গৌরীর বিবাহ হইল, কিন্তু পাগলের সহিত নহে এবং যোগ্য পাত্রের সহিতও নহে। মহাকুলীন চৌধুরী মহাশয় কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কন্যাকে এক পঞ্চাশৎ বর্ষীয় বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৌরী-প্রস্তা পুতুলখেলা ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়ী গেল—পাগলা আবার ক্ষেপিয়া উঠিল।

মধ্যে কয়দিবস সে ছিল ভাল। সকলের মুখে গালভরা হাসি, চক্ষে স্পষ্টোজ্জ্বল আনন্দ-জ্যোতিঃ ঘন ঘন শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি তাহার প্রাণে অপরিসীম সন্তোষ সৃজন করিয়াছিল। কিন্তু যখন চেলী ও সিন্দুর পরা গৌরী পাল্কীতে চড়িয়া বসিল এবং পাল্কীখানা তাহাকে লইয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, সানাইয়ের সুর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কাণে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল, তখন রুদ্ধ উচ্ছাসভরে পাগলের বক্ষদেশ ফুলিয়া উঠিতে সুরু করিল। যখন প্রাঙ্গ-নশির হইতে খাটান পাল নামান হইল, অমন্ত্রিত কুটুম্ববর্গ বিদায়গ্রহণ করিল, যে উৎসাহ বাড়ীখানা ভরিয়া দিয়াছিল—তাহা লোপ পাইল, তখন পাগলের দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর বেগে জল বহিতে লাগিল। ছাদে উঠিয়া দেখিল গৌরীর গমনশীল শিবিকাখানি দূর দিগন্তের তলে তখনও দেখা যাইতেছে—গৌরী কবে ফিরিবে কে জানে? পাগলি ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। চৌধুরী মহাশয় অল-ক্ষণ বিবেচনা করিয়া তিরস্কারের বাকী রাখি-লেন না; পাগল দুই হস্তে মুখ লুকাইয়া নদী-তীরে কম্পিতপত্র অশ্বত্থতলে বসিয়া রহিল! অপরাহ্নে গৌরীর মা কত করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক উঠাইয়া আনিলেন।

তদবধি প্রতি রাত্রে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে মাঝে মাঝে ক্রন্দনরব আসিয়া চৌধুরী মহাশয়ের নিদ্রার ব্যাঘাত করিত।

বিবাহ এক মাস পরে থান পরিয়া গৌরী পুনরায় বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার আগমনে প্রতিবেশীবর্গ হাহাকার করিয়া উঠিল, পিতামাতা ভূতলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। কেবল পাগল আনন্দে অধীর হইল।

চৌধুরী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কহিলেন,—হতভাগা! তুই রোজ রোজ কেঁদে কেঁদে অমঙ্গল ডেকে আনলি! তোর জন্যেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটলো! এই বলিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ শব্দে গোটাকতক চড় কসা-ইয়া তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে উচ্চ চীৎকার সহকারে পলায়ন করিল।

বিধবা হইয়া গৌরী এক দিনও কাঁদে নাই, আজ কিন্তু অশ্রুজল সামলাইতে পারিল না। থাকিয়া থাকিয়া প্রহৃত বালকের ব্যথিত মুখশ্রী মনের মাঝে জাগিতে লাগিল, সেই সঙ্গে মর্ম্মা-ভ্যন্তর হইতে মমতার উৎস উথলিতে আরম্ভ করিল। যেন চড়গুলা তাহারই গালের উপর পড়িয়াছে, সে সম্পূর্ণরূপে তাহার জ্বালা অনুভব করিতেছে। গৌরী অনেকবার বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল, পাগলা মার খাইয়া অভিমান ভরে যেদিকে চলিয়া গিয়াছে, বহুক্ষণ ধরিয়া পলক-বিহীন দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। যেন

তাহার সমস্ত ব্যথা সে নিজের হৃদয় দিয়া সযত্নে মুছিয়া দিতে চায়—কিন্তু পাগল কোথা ?

(৩)

পশ্চিমাম্বরে সূর্য্য হেলিয়া পড়িল, তাল-কুঞ্জের উপরে বাবুইয়ের ঝাঁক উড়িতে লাগিল; স্নানঘাট হইতে রমণীগণ কলসী ভরিয়া জল লইয়া গেল. ওপার হইতে চরাগরুর দল ঘরে ফিরিয়া আসিল, ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল তথাপি পাগলের দেখা নাই।

সন্ধ্যার পর ঝড় উঠিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল উপর্য্যুপরি বজ্রনিনাদে দিক-মণ্ডল কাঁপিতে লাগিল। গৌরী পিতার নিকট গিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল বাবা। পাগলা কোথা ? চৌধুরী কোন উত্তর দিলেন না সন্তপ্তা বালিকার অন্তর মধ্যে ক্রমাগত প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—পাগল কোথা ? বাহিরে এই প্রলয়ের অন্ধকার, এই ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগ, সকলের দ্বার রুদ্ধ – পাগল কোথা ?

গভীর রাত্রে সুপ্ত পিতার নাক ডাকিতে-ছিল হঠাৎ গৌরীর মনে হইল কে যেন অর্গল-বদ্ধ বহির্দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ করাঘাত করিতেছে—বুঝি পাগল ফিরিয়া আসিয়াছে। গৌরী জানালা খুলিয়া তিনবার ডাকিল পাগল! পাগল! পাগল! বারিপাতের তুমুল কল্লোল ভেদ করিয়া কোন মানব কণ্ঠ সাড়া দিল না! বৃষ্টির ঝাপট গৌরীর মুখের উপর পড়িতে লাগিল—পাগল কোথা ?

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। পাগলকে সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল গৌরী ভোলে নাই।

গৌরী পিতার নিকট মন্ত্র লইয়াছে। সে এখন প্রাতঃস্নান করিয়া পূজার ফুল তোলে, চন্দন ঘসে, সাজি ও নৈবেদ্য সাজায়. মন্দিরের কার্য্য শেষ হইলে পাড়ায় বাহির হয়, কাহার কি অভাব সন্ধান লয়, রোগীর সেবা করে, ক্ষুধার্ত্ত দেখিলে ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইবার জন্য পাঠাইয়া দেয়; কাহারও বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম থাকিলে রন্ধনের ভার তাহারই উপর পড়ে।

তাহার শরীরে আজ কাল রূপ ধরিতেছে না; কিন্তু সে রূপে প্রখরতা নাই, আছে কেবল স্নিগ্ধতা দেখিতে হঠাৎ দেবী বলিয়া ভ্রম হয়। তদুপরি যখন পরদুঃখ দর্শনে দেবীর নয়নযুগল বিগলিত হইতে থাকে, তখন সেই মূর্ত্তি আরও মহিয়সী হইয়া আপনা হইতেই হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তখন মন্দিরের প্রতিমা ছাড়িয়া তাহারই প্রতি চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু একই সমুদ্র মন্থন করিয়া পাত্রভেদে অমৃত এবং গরল লাভ হইয়াছিল। গ্রামে এর্ফাণ খাঁ নামে এক উচ্ছৃঙ্খলমতি মুসলমান যুবক পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বিলাস-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। গৌরীর রূপরাশি দেখিয়া তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, হিতাহিত জ্ঞান কোথায় অন্তর্দ্ধ্যান করিল—ঠিক রহিল না; বুকের ভিতর যে পাবকশিখা জ্বলিতে লাগিল, হতভাগ্য ভাবিল—গৌরীবিনা তাহা নির্ব্বাপিত হইবার আশা বিরল।

তখন পাপাত্মা এর্ফাণ একটী পরহিত ব্রত-

"কি শুনিতে চাও" ? স্নেহলতার নয়নে আবার বিদ্যুৎ-বিকাশ হইল।

"সে কে" ?

"সে আমার শত্রু, পরম শত্রু। তাহার নাম অজিত কুমার। যখন হুগলীতে ছিলাম, তখন হইতে সে আমার সর্ব্বনাশ-সাধনে তৎপর হইয়াছে। হুগলি হইতে বর্দ্ধমানে পলায়ন করিয়াছিলাম, সেখান হইতে কল্যাণশ্রী গ্রামে পর্ণ কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম—শত্রু সেখানেও আমার সন্ধান পাইয়াছিল ; এখন প্রেতবনে আসিয়াছি, দেখিতেছি এখানেও নিস্তার নাই। তাহাকে হত্যা না করিলে আমি কোথাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব না"।

"সে কেন তোমার সন্ধান করিতেছে ?"

"সে কথা পরে বলিব। আগে তাহাকে হত্যা কর, পরে দাসী হইয়া তোমাকে সকল কথাই বলিব।"

"কাল গঙ্গার ঘাটে কই সে ত তোমাকে কোন কথাই বলিল না ?"

"সুযোগ পায় নাই ; আমাকে কোন কথা বলিবার নাই, আমাকে সে হত্যা করিবে।"

সুকুমার চমকিত হইল। বলিল, আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না লতা।"

"পরে বুঝিবে।"

"বেশ, এবার স্থির জানিও আমি তাহাকে হত্যা করিব। কিন্তু—"

"বুঝিয়াছি ; তোমাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে বলি না। তাহাকে আহ্বান কর, উভয়ে বলপরীক্ষা কর। তোমার শৌর্য্য আমার জানা আছে, সে অবশ্যই প্রাণ হারাইবে তুমি কালু সর্দ্দারের শিষ্য, কাপুরুষ হইয়া তাহাকে হত্যা করিও না। তবে একটী কথা—সে তরবারি চালনায় সুদক্ষ, তুমি পিস্তল ব্যবহার করিও।"

"বেশ, একবার শত্রুকে দেখিয়া আসি। স্নেহ, তোমার জন্য আমি সকল কর্ম্মই করিতে পারি।" সুকুমার চলিয়া গেল।

গলায় দড়ি।

—:•:—

গল্প।

(১)

এক পার্শ্বে গ্রাম জঙ্গল-উলুবন ও অপর পার্শ্বে পটোলের ক্ষেত্র, আকের ক্ষেত্র এবং আউস ধানের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যে ছোট্ট নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, বৎসরের সাত মাস তাহা শুষ্ক লতিকার ন্যায় নিতান্ত শীর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকে। তখন মৃতস্রোত জলতলে শৈবালাদি গুল্ম জন্মায়, কৃষাণেরা হাঁটিয়া পারাপার করে, জেলেরা ডিঙ্গীগুলা ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখিয়া পোলো দিয়া মাছ ধরে এবং গ্রামের পাগলা ছেলেটা অতি সহজেই ওপার হইতে আকন্দ ফুল সংগ্রহ করিয়া আনে।

ছেলেটার কি নাম কেহই জানে না ; সকলেই তাহাকে পাগলা বলিয়া ডাকে। বাস্তবিকই সে পাগল। নিতান্ত বদ্ধ রকমের না হইলেও তাহার কথাবার্ত্তায় এবং কার্য্য-প্রণালীতে প্রচুর পরিমাণে অসংলগ্নতা প্রকাশ পায়। সে কখন কি বলে, কখন কি করে কিছু মাত্র ঠিক নাই।

গ্রামের মধ্যে অতবড় দুরন্ত ছেলে আর নাই। পিতৃমাতৃহীন ছেলের দৌরাত্ম্য কেহ সহ্য করিতে চায় না, সকলে গালি দেয়, শাসন করিতে আসে। পাগল তন্মধ্যে একজন ব্যতীত আর কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করে না।

সে যেরূপ রাশভারি তেমন আর কেহ নয়; সে সেই চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা গৌরী। পাগলের উপর তাহারই কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব খাটিতে পায়, পক্ষান্তরে তাহার নষ্টামীও বালিকা কতক কতক সহিয়া থাকে। চৌধুরী মহাশয় গ্রামস্থ কালী মন্দিরের অধিকারী-পাশেই বাড়ী। দেবত্র সম্পত্তির আয় হইতে বিনাকষ্টে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। পাগল দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাঁহারই চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া থাকে, গৌরীর নির্দ্দেশমত বাগানের ফল পাড়ে, তাহার খোকা ভাইটি কাঁদিলে কোলে লইয়া শান্ত করে, নাচায় খেলা দেয়, ছোট ছোট কাজকর্ম্ম করে, হাটতলায় ডাক বাক্সে চিঠি ফেলিয়া আসে এবং পূজাকালে মন্দির দ্বারে মহোল্লাসে কাঁসর বাজায়।

আবার যখন যৌবন সঞ্চারে শারীরিক পুষ্টিলাভের ন্যায় নববর্ষার বন্যায় নদীর ঢলনামা জল বাঁশ গাছের গোড়ায় গোড়ায় আসিয়া ঠেকে, উদ্দাম গতিতে নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট পথের উপর দিয়া সে ছুটিয়া বহিয়া যায়, চাষার দল ভেলায় চড়িয়া ওপারে যাতায়াত করে, পাঠশালার ছুটি হয় এবং ছেলেগুলা জলবেড়াবেড়ি খেলিতে পাইয়া বাঁচে, আকাশে মেঘ জমিতে থাকে, বাদলা নামে, বারিধারা ঝরে, তখন এক এক দিন পাগলা ক্ষেপিয়া উঠে। সে দিন সে এমনই বাঁকিয়া দাঁড়ায় যে কোনমতেই তাহাকে বাগ মানান যায় না। সে হয় ত পাড়া ছাড়িয়া, গ্রাম ছাড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়, অথবা নির্জ্জন পথিপার্শ্বে পত্রবিরল বৃক্ষতলে একেলা বসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া কি যে মাথামুণ্ডু ভাবে তা সেই জানে। তখন বহিঃপ্রকৃতির উন্মত্ততা ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন তাহার এককালে দর্শনীয় ও চিন্তনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। আকাশের নিলীমা, উচ্চতা, দৈর্ঘ্য এবং পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত বর্ণরাজীর মিশ্রণ ও বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে করিতে পাগল হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে, কভু বা কাঁদিয়া অস্থির হয়।

তার পর যেদিন মেঘ কাটিয়া যায়, আকাশে চাঁদ উঠে, বনে ফুল ফোটে, দক্ষিণ বাতাস বয়, নদীর জল খল খল করে, তখন হয় ত সে গৌরীর নিকট আসিয়া দাঁড়ায়—খেয়ালের ঝোঁকে তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। গৌরী ভ্রূকুটি করিলে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রয়, ধমক দিলে কাঁদ কাঁদ হয়, এবং তাহার প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পাগলের মুখে আর হাসি ধরে না। সে তখন বাঁধাঘাটের সর্ব্বশেষ রাণায় বসিয়া উচ্চকণ্ঠে যাত্রার গান গাহিতে থাকে :—

(ওহে) দয়া করে ধরেছ হে সুদর্শন রূপখান
মনরূপ মন্তলেতে আমি বেঁধেছি গো বাসনা

ক্রমশঃ

ধারিণী সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

গৌরীর এক সই ছিল, আজ তাহার পুত্রের অন্নপ্রাসন। সই গৌরীকে ধরিয়াছিল—সমস্ত করিয়া দিতে হইবে। গৌরী সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারে নাই। একজন মাত্র সঙ্গিনী লইয়া প্রথমেই সে সইএর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে এবং সারাদিন পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়াছে।

সায়াহ্নকালেই সে যাইতে চাহিল, সই ছাড়িল না। আত্মীয়তা করিয়া অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখিল। অবশেষে গৌরী যখন বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, তখন যামিনীর প্রথম যাম উত্তীর্ণ হইয়াছে; বিমল চন্দ্রকিরণে জগৎ প্লাবিত হইতেছে দেখিয়া সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে সে দ্রুত চলিল। পল্লীমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে মাথার উপর কালপেঁচা তীব্র স্বরে ডাকিয়া গেল এবং একটা অনৈসর্গিক ভয় তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, প্রতিপদে একটা অমঙ্গলাশঙ্কা তাঁহার পা যেন বেড়িয়া বেড়িয়া ধরিতে লাগিল, তথাপি সে সাহসে ভর করিয়া চলিল। বাড়ীর সন্নিকটস্থ হইবা মাত্র—ও হরি কোথা হইতে দুইটা পুরুষ দৌড়িয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সঙ্গিনীর মুখে গামছা বাঁধিয়া তাহাকে লইয়া উধাও হইয়া গেল। তদ্দর্শনে গৌরী দৌড়িল; বাটীর দরজা বন্ধ ছিল কিন্তু মন্দিরের দ্বার খোলা দেখিয়া সে তাহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং কপাটে খিল লাগাইয়া দিল।

একা'ণ তফাতে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার অনুচর দ্বয় যে ভ্রম করিল তাহা সে দেখিল; তখন পাপিষ্ঠ ধীরে ধীরে মন্দিরের রোয়াকে গিয়া উঠিল—কিন্তু রুদ্ধ দরজা কোন মতেই খুলিতে পারিল না। এর্কা'ণ সারারাত্রি চেষ্টা করিল, কিছুতেই খিল ভাঙ্গিল না।

৪

ভিতরে গৌরী প্রতিমার পদতলে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে।

অতঃপর নিরুপায় হইয়া দুরাত্মা আর এক অভিসন্ধি আঁটিল। প্রত্যূষে যেই উৎকণ্ঠিত চৌধুরী বাটীর মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন, অমনই এর্কা'ণ তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। চৌধুরী শশব্যস্ত হইয়া কারণ জানিতে চাহিলে সে বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করিল—এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। চৌধুরী হাঁ করিয়া রহিলেন, নিদ্রা হইতে জাগিয়াছেন কি এখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার খড়মের শব্দ শুনিতে পাইয়া সাহসে ভর করিয়া গৌরী মন্দির হইতে বাহিরে আসিল। তাহাকে সেখানে দেখিবামাত্র চৌধুরী মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। এর্কা'ণ সুযোগ বুঝিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিল।

প্রহরেক বেলা না হইতেই এই অলীক কুৎসিত কথা সত্যাকারে সর্ব্বত্র কেমন করিয়া রাষ্ট্র হইল কে জানে? কিন্তু তখন আর কাহারও মুখে চাপা দিবার উপায় রহিল না। সে দিন সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামখানি এই প্রমাণহীন প্রসঙ্গের আলোচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

পিতা মাতা বিশ্বাসও করিতে পারিলেন না, অবিশ্বাসও করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের

নীরব দৃষ্টি যেন ভৎর্সনা সহকারে স্পষ্ট বলিতে লাগিল—কপালখাগি! তোর কি দড়ি কলসী জুটলো না!

গৌরী চমকিয়া চক্ষু মুদিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, আত্মপরবঞ্চক মানব সমাজই তাহাকে আপনার গণ্ডী হইতে বিনাদোষে বিচ্ছিন্ন করিয়া এমন স্থানে ফেলিয়া দিতেছে—যেখানে দেশ নাই, প্রাণী নাই, আছে কেবল মহাশূন্য ও অনন্ত প্রাণ, কায়া নাই ছায়া নাই, আছে কেবল ভাব ও অনুভূতি; বাণী নাই—ভাষা আছে, গান নাই সুর আছে, মিথ্যা নাই—সত্য আছে, চাঞ্চল্য নাই—অন্তহীন বিরাম আছে, সুখ নাই, দুঃখ নাই—অনন্ত শান্তি আছে। গত নিশিতে যিনি মূর্ত্তির মধ্যে থাকিয়া চরণ প্রান্তে স্থান দিয়াছিলেন আজ যেন তিনি আকাশ-অন্তরীক্ষ এবং ভূমণ্ডলব্যাপী মহাপ্রাণময় হইয়া তাহাকে আপনার প্রাণের ভিতর মিশাইয়া লইতেছেন। ছার সংসার! তাঁহার মহিমার নিকট পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র।

সে রাত্রিতে যখন চতুর্দ্দশীর চাঁদখানির তলদেশ দিয়া এক এক খানা ধূসরবর্ণ অনল্পপরিসর মেঘখণ্ড ভাসিয়া যাইতেছিল এবং পৃথিবীর উপর একবার কালোছায়া, একবার শুভ্র আলো আসিয়া পড়িতেছিল, তখন বাতাস নিরুদ্ধ, তরুপল্লব স্থির, বনপ্রান্তে ঝিল্লীরব নীরব ছিল এবং নদীর জল আয়নার মত স্বচ্ছ ও নিষ্কম্প দেখাইতেছিল। সহসা সেই নীরবতার মধ্যে ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। সেই সঙ্গে নদীর জল অনেকখানি ছিটাইয়া উঠিল এবং একটা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেকগুলা চন্দ্র ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল, ক্রমে জল শান্ত হইয়া আসিল, তরঙ্গ লহরীতে লহরীতেবীচি বল্লরীতে পরিণত হইতে থাকিল।

সকালে সর্ব্বপ্রথমে যে স্নানার্থিনী রমণীদল ঘাটে আসিলেন, এক ভয়াবহ অদ্ভুত দৃশ্য যুগপৎ তাঁহাদিগকে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিল। চাঁপা গাছের নীচে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে। সকলে হাউ মাউ চাউ করিয়া উঠিলেন।

সংবাদ পাইয়া চৌধুরী মহাশয় তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইলেন এবং বহুক্ষণ দেখিবার পর কহিলেন—পাগল।

অকস্মাৎ জলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, দেখিলেন—কালো জল আলো হইয়াছে—গৌরী তাঁহার ঘরে নাই—জলতলে! তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রজা পাঁচু ঘোষ ফাঁড়িতে খবর দিতে ছুটিল। ফাঁড়িদার তখন এক জন অপঘাতীর অন্তিম জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছিল।

ফাঁড়িদার কহিল—বল তোমার নাম কি?

"এর্ফাণ খাঁ!

"কে তোমায় ছুরি মারিয়াছিল?

"পাগল!

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

অভিলাষ।

—:০:—

বিভু　কাঁদিয়ে বেড়াই কেহ ত চাহে না
　　চাহ কি দয়াল তুমি?
আমি,　মনোবেদনায় দিবা নিশি জ্বলি
　　তাও কি বুঝনা স্বামি!
প্রভু! জগতের কোণে একাকী বসিয়া
　　বিরলে তোমায় ডাকি;
দেব!　এই হীন জনে তবু কি গো তুমি
　　দিতে চাও সদা ফাঁকি?
নাথ!　যতই তুমি দূরে যাও না কেন
　　আমিও যাইব পাছে,
পিত!　এই দীন সুত যতদূর পারে
　　থাকিবে চরণ কাছে।
প্রিয়,　যদি কভু পাই সম্মুখে তোমারে
　　হাতে দিয়ে হৃদি খান।
শুধু　চিরদিন বিভু! মন প্রাণ খুলে
　　গাব তব যশোগান॥

শ্রীবেণীমোহন বিশ্বাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:০:—

অনাথ বন্ধু সমিতি। বাঁটরা অনাথ-বন্ধু সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন এবার বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই গ্রামের কতকগুলি যুবকের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই মহৎ কার্য্য আজ পাঁচ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। কয়েক জন হৃদ্ব ব্যক্তি এই সমিতি হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইতেছে। সহায় সম্পত্তিহীন অনাথ ও অনাথাগণকে সাহায্য করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। সুপ্রসিদ্ধ বক্তা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মিত্র মহোদয় এবং অপরাপর বক্তাগণ সেদিন সভাস্থলে দানধর্ম্মের উপকারিতা বেশ সরল ও সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আজ কাল দেশের যেরূপ দুরাবস্থা হইতেছে, তাহাতে গ্রামে গ্রামে এরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেরই সহানুভূতি থাকিলে অনেক অনেক নিরন্ন ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির যে উপকার সাধিত হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু বিশেষ দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, সে দিন এই সভায় গ্রামের অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণ আমন্ত্রিত হইয়াও উপস্থিত হন নাই, এমন কি অনেক বিশিষ্ট সভ্যকেও সেদিন সভাস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এ সভার সহিত রাজনৈতিক কোন বিষয়ের সংস্রব নাই, তবে কেন যে তাঁহারা উপস্থিত হন নাই—বলিতে পারি না। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম। বাঁটরার বিজ্ঞতম কবিরাজ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ অধিকারী মহাশয় তদীয় পুত্রের শুভ বিবাহোপলক্ষে এই সমিতিতে এককালীন ৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন, এবং অপরাপর কয়েকজন দাতাও দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা এই সকল পরদুঃখ কাতর মহাত্মাগণের উন্নতি কামনা করি। সৎকর্ম্মপরায়ণ মহাপ্রাণ যুবকগণের উদ্যোগে স্থাপিত এই সভা যাহাতে দিন দিন উন্নতির

পথে অগ্রসর হইয়া নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে, গ্রামবাসী শিক্ষিত এবং ধনী মহাত্মাগণ সে বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি করিলে আমরা সুখী হইব।

—:•:—

সৎকার্য্য। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়া সুখী হইলাম যে কলিকাতা বৈঠকখানার সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার স্বগ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত সিংটী শিবপুরের অধীন উদয়নারায়ণপুর গ্রামে তদীয় স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতি সংরক্ষনার্থ একটী উচ্চ বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আধুনিক ধনীগণের ন্যায় নাম বজায় করিবার জন্য কোন কার্য্য করেন না। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ, যাহা উপযুক্ত এবং ধর্ম্মসঙ্গত মনে করেন—তাহাতে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। অতুল ধনের অধীশ্বর হইযাও সারদাবাবুর কিছুমাত্র অহংকার নাই; তাঁহার ন্যায় অমায়িক প্রকৃতি সম্পন্ন, মিষ্টভাষী ধনী আমরা কখন নয়নগোচর করি নাই। আমাদের এই পবিত্র আর্য্যেরদেশে এই দারুণ দুর্দ্দিনে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যতই জন্মগ্রহণ করেন ততই মঙ্গল। অতঃপর ধার্ম্মিকবরের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পিতার সদ্গুণাবলীর অনুসরণ করিয়া পূজনীয় পিতার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা করুন এবং ভবিষ্যতে পিতার কীর্ত্তিকলাপ ও বংশমর্য্যাদা অক্ষুন্ন ভাবে রক্ষা করুণ, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

পরলোক। সাহিত্যক্ষেত্র ক্রমশঃ রথীশূন্য হইতেছে। বাঙ্গালার আর একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র কাল সাগরে নিমর্জ্জিত হইল। কায়স্থকুলতিলক, বসু বংশজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আজ লোকলোচনের বহির্ভূত, পার্থীব ভোগৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া তিনি আজ পরলোকে; চন্দ্রনাথ বাবু সাহিত্য-গগণের একটী উজ্জ্বলরত্ন, তাঁহার ত্রিধারা প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালায় অতুলনীয়। বসুজ মহাশয় দেশের প্রিয়পাত্র ছিলেন, বহুদিন ধরিয়া তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের অনুবাদক রূপে কার্য্য করিয়া সরকার বাহাদুরের নিকটও বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় প্রাচীন সাহিত্যসেবীর মৃত্যুতে দেশের অনেক ক্ষতি হইল। যে সকল ক্ষতি হইতেছে তাহার আর পুরণ হইতেছে না। কিন্তু ভগবানের বিচিত্র বিধানে কিছুই ত চিরস্থায়ী নহে এই বলিয়া আমরা মনকে প্রবোধ দিই। এক্ষণে একান্তমনে প্রার্থনা—ভগবান এই পরলোক গত পবিত্রাত্মার আত্মাকে চির শান্তি বিধান করুন।

—:•:—

উপাধি বর্ষণ। সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে এবারও উপাধি বর্ষণ হইয়াছে। দেশের অনেক মহাত্মা রাজকীয় যোগ্য সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। দেশীয় লোকে সম্মানিত হইলে আমরা সাতিশয় সুখী কিন্তু উচ্চপদের মদগর্ব্বে আত্মহারা হইয়া তাঁহাদের পদবৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি যেন পরিস্ফুট হয়, মহত্ত্ব বিলুপ্ত না হন, এইরূপ দেখিতে পাইলে আমরা

পদ মর্য্যাদার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিব। নতুবা কেবলমাত্র উচ্চপদ লইয়া কে কবে প্রকৃত বড় হইতে পারিতেছে? উচ্চ হৃদয়ই ত শ্রেষ্ঠত্বের এবং মহত্বের পরিচায়ক। উচ্চ পদস্থ বড়লোকের মধ্যে ইহা কয়জন বুঝেন ও তদনুসারে কার্য্য করেন? আমরা ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার জমিদারগণের কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ইহাতে ভাল মন্দ সকলই থাকিবে।

বালবিধবা।

—:০—

সত্য ঘটনা।

১।

দশ বছরের বিন্দু, বালিকা এখন—
আজো সে খেলার ঘরে
সারাদিন খেলা করে
রাঁধিয়া মাটির ভাত, মাটীর ব্যঞ্জন।
গান গেয়ে, হুলু দিয়ে,
পুতুলের দেয় বিয়ে,
পরায়ে রক্তিমবাস নানা আভরণ,
আজো তার হ'লে ক্রোধ
নাহি থাকে বিন্দু বোধ
"হাঁড়ি কুড়ি" ভেঙ্গে ফেলে করে সে ক্রন্দন;
দশ বছরের বিন্দু, বালিকা এখন।

২।

দশ বছরের বিন্দু, বালিকা এখন।
বাল্য-সহচরী সনে
আজো সে প্রফুল্ল-প্রাণে
ছুটোছুটী করি খেলা করে অনুক্ষণ।
পাড়ায় বেড়াতে গেলে,
সারাদিন থাকে ভুলে,
খাবার কথাও তা'র থাকেনা স্মরণ!
রাগ করে গালি দিলে,
চেয়ে থাকে মুখ তুলে,
নীরবে দাঁড়ায়ে করে অশ্রু-বরিষণ!
আবার আদর করে
ডাকিয়া লইলে তারে,
দেখিতে দেখিতে হয় প্রফুল্ল-বদন!
দশ বছরের বিন্দু বালিকা এখন।

৩।

দশ বছরের বিন্দু, বালিকা এখন—
আজো সে লইয়া ডালা,
প্রতিদিন ভোর বেলা,
কাননে কাননে করে কুসুম-চয়ন;
শেফালি, বকুল, যুঁথি,
তুলি ফুল নানা জাতি,
যতনে বসিয়া গাঁথে হার-সুচিক্কণ!
কুসুমের মালা গড়ে'
পরে সুকোমল করে
সাজায় সুচারু ফুল-নূপুরে চরণ!
ফুলরাণী সেজে আসি,
মাতারে দেখায় হাসি,
পুরস্কার ল'তে শত স্নেহের চুম্বন!
দশ বছরের বিন্দু, বালিকা এখন।

৪।

দশ বছরের বিন্দু, বালিকা এখন—
আজো সে কোমলা বালা,
বুঝেনা ধরার জ্বালা,
খেলা ধূলা লয়ে আছে ব্যস্ত অনুক্ষণ!

আজো সে মায়ের বুকে
রহিয়াছে কত সুখে
দেখেনি দুখের মুখ স্বপনে কখন ;--
সরলা বালিকা সে যে,
শোক তাপ নাহি বুঝে
আজিও প্রফুল্ল তাই চারু চন্দ্রানন !
জানেনা কেমন ক'রে
অজ্ঞাতে পড়েছে শিরে
বিধির আগ্নেয়-অস্ত্র "বৈধব্য" ভীষণ—
দশ বছরের বিন্দু, বালিকা এখন।

৫।

দশ বছরের বিন্দু, বালিকা এখন—
বুঝেনি সে হায়, হায়,
নিদারুণ বিধাতায়
নিয়াছে কাড়িয়া তা'র অমূল্য রতন !
ধরার সুখের আশা,
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা,
সকলি গিয়াছে তা'র জন্মের মতন !
কোমলা বালিকা দেখে,
দয়া যদি নাহি বুকে,
চির দুঃখ স্রোতে যদি দিলে বিসর্জ্জন—
তবে, তা'র ব্যথাগুলি
দিও বিভো! দিও খুলি'
তোমারি প্রেমেতে তা'রে ক'রো আবাহন ;
দশ বছরের "বিন্দু", বালিকা এখন !

শ্রীসুরেশ চন্দ্র নন্দী।

—:০:—

প্রার্থনা।

—:০:—

বুক ফাটে মোর দুঃখে ;---
কেইবা বুঝিবে, কেইবা শুনিবে,
কি আগুন জ্বলে বুকে।
খাই যার মাই, তাহারে না পাই
আদরে যে রাখে বুকে।
কি পড়েছে চোখে, ফেল মাগো দে'খে ;
—মা বিনা কে দেখে দুখে?
আছি কোণে পড়ে', হাতাড়ি আঁধারে
অবশ শরীরে তোকে
আছ বা মা নাই, বুঝিতে না পাই
বলিব মা দুখ কা'কে ?
সে'রে দে মা চোখ, নির্ব্বাপিত হো'ক্
জ্বলিছে যে জ্বালা বুকে।
অবশ দেহ মা! সবশ ক'রে দে
সমর্থ বুঝিতে তোকে।
যেন তোর বুকে, হাঁসিভরা মুখে
(তোরে) নিরখি, থাকি মা! সুখে।

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

—:০:—

পাষাণী।

—:০:—

১।

ভাষার পাষাণ তলে ভাবের সলিল চলে
নীরব-বাহিনী ;
সংসার খোঁজেনা তায়, সংসার বোঝেনা হায়,
হৃদের গভীর তলে সে কোন্ যোগিনী ;

হাসিয়ে টাসিতে গেলে অশ্রু দোলে আঁখিকোলে
মানুষ বোঝেনা তা'র মরম-কাহিনী!
ছায়া আসি আলো ঢাকে লুকাতে পারেনা তাকে
তবু কে জীয়ায়ে রাখে—কে সে মায়াবিনী?
ওযে, নীরব-বাহিনী।

২।

পাষাণে পাষাণ-ঘায় অগ্নিকণা বাহিরায়
পোড়াতে পাষাণে
কত মাটী, কত মলা, কত শত ধাতু গলা
ছেয়ে ফেলে বুক তা'র শ্মশানে শ্মশানে;
আকাশে জলদ থাকে ঢালেনা সলিল তাকে,
শুধুই—শুধুই আহা বুকে বজ্র হানে—
'অমনি পাষাণ ফেটে সলিলের ধারা ছোটে,
আপনি আপন স্নেহে জুড়াতে সে জানে
ওগো, তাপিত পরাণে।

৩।

মেঘেতে অশনি দোলে, বিজলীও তা'র কোলে,
পুনঃ ঝরে জল—
তেজ জ্যোতিঃ এক (ই) বুকে, ঘুমায় পরম সুখে
আবার সলিল ঢালে নয়ন-কমল!
ধরনী-চরণ-পুটে আঁখিজল পড়ে লুটে,
মানব স্বপন দেখে ঘুমায়ে কেবল;
পাষাণী চাহিয়া থাকে, কে জানে সে কারে ডাকে
হৃদয় কম্পনে তা'র ধরা টলমল—
(তবু) আঁখি শিশির-সজল!

৪।

মেঘ যদি কভু কাঁদে পাষাণী হৃদয়-ফাঁদে
ধরে অশ্রুজল!
প্রতিবিন্দু আঁখিবারি আপন হৃদয় চিরি
সঞ্চয় করিতে কভু নহে সে চঞ্চল;
কাঠিন্য-প্রলেপ দিয়া কোমলতা লুকাইয়া,
কত বর্ষ, কত যুগ রহে সে অটল—
সহসা কঠোর হিয়া কি ভেবে খুলিয়া দিয়া
নদী বহাইয়া দেয় কল্ কল্ কল্
আহা, কঠোরে কোমল!

৫।

তপন গগনে ভাসি টানে সেই বারিরাশি
কর প্রসারিয়া—
বিস্ময়ে প্রকৃতি দেখে, বিজ্ঞানেরে সাক্ষী রাখে,
জলদ ভাণ্ডার পূর্ণ সেই বারি দিয়া!
পাষাণীর শূন্য প্রাণে তবু সে অশনি হানে
তরল মেঘের ছি ছি কি কঠোর হিয়া!
পাষাণী হাসিয়া উঠে,— প্রকৃতির হৃদিপটে
সে হাসি-হিল্লোল আসে বাতাসে ভাসিয়া,
তার—হৃদয় বহিয়া!

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ঘোষ।

—ঃঃ—

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—ঃ•ঃ—

বিশ্বদূত।—একখানি রাজভক্ত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র, আজ প্রায় ছয় মাস কাল নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। সময়ে সময়ে ইহাতে অনেক সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হাওড়া ২৩নং কালীকুণ্ডুর লেনে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিলে বিনামূল্যে নমুনা পাইবেন।

বাণী।—একখানি মাসিক পত্র, শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পত্রিকাখানি উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়া আজ তিন বৎসর কাল বেশ দক্ষতার সহিত পরি-

চালিত হইতেছে। বৈশাখ সংখ্যার "আবাহন" কবিতাটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। প্রাচীন বিষ্ণুপুর ও বর্গীর হাঙ্গামা সুলিখিত প্রবন্ধ। "স্নেহের জয়" ক্ষুদ্র গল্পটী বাণীতে স্থান না পাইলেই ভাল হইত, ইহাতে স্থানে স্থানে ভাষার আদ্য-শ্রাদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। "দ্বারকা" প্রবন্ধটী মন্দ হয় নাই, অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পত্রিকাখানির কাগজ, ছবি, ছাপা অতি উৎকৃষ্ট। আমরা সহযোগিনীর ক্রমোন্নতি কামনা করি।

অলৌকিক রহস্য।—এই মাসিক পত্রিকাখানির দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। পত্রিকাখানি অল্পদিনের মধ্যে গল্পপ্রিয় পাঠক বর্গের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। অলৌকিক রহস্য পাঠে শুধু গল্প কেন, ভৌতিক তত্বেরও অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় পত্রিকা পরিচালনে বিশেষ পারদর্শী, তাঁহাদের দ্বারা যে নবীন সহযোগী দিন দিন উন্নতিমার্গে আরোহন করিবে ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

কর্ম্মফল ও ষটচক্রভেদ।—শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ স্বামী প্রণীত, হিন্দুর অনেক গুঢ় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠে সকলেই আনন্দানুভব করিবেন। পুস্তকের মূল্য অতি অল্প গ্রন্থকারের নিকট ১৪৬নং খুরুট রোড হাওড়া ঠিকানায় ৷৵৹ আনা মাত্র পাঠাইলেই পাইবেন-আমরা ইহা পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি।

মদন বটিকা।—আমরা ১০২নং খুরুট রোড হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম প্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ মহোদয়ের নিকট একটী বন্ধুকে চিকিৎসার্থ পাঠাইয়াছিলাম। বন্ধুটী নানাবিধ রোগে এতদিন ভুগিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের "শক্তি বটিকা" সেবনে তিনি বিশেষ সুফল পাইয়াছেন। মদন বটিকা যে অম্ল,অজীর্ণ ও ক্ষুধা বৃদ্ধির বিশেষ উপকারী মহৌষধ তাহা বন্ধুরটীর চিকিৎসায় বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। কবিরাজ মহাশয় শাস্ত্রীয় ঔষধ সমূহ বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রস্তুত করেন বলিয়া ফল এত সত্বর উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমরা সকল চিকিৎসার্থীকে একবার ইঁহার নিকট পরীক্ষিত হইতে অনুরোধ করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিগত বৈশাখ মাস হইতে আমাদের কার্য্যে নানাপ্রকার ত্রুটী হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়ের পরিবারবর্গের মধ্যে এই মাসত্রয়ব্যাপী দৈবদুর্ব্বিপাকই তাহার একমাত্র কারণ জানিয়া গ্রাহকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রাহকই পত্রিকার প্রাণ—আমরা আগামী সপ্তাহের মধ্যে সকল গ্রাহকের নিকট আলোচনার উপাদেয় ৪ খানি উপহার সহ ভিঃ পিঃ করিব। উপহার সংখ্যায় অতি অল্প, এক মাস পরে আর দিতে পারিব না, যাহার আপত্তি থাকে ২।১ দিনের মধ্যে জানাইবেন। নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেন—ইহাই প্রার্থনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

চয়ন।

প্রার্থনা।

—:•:—

হে অনন্ত, হে মহান!
মগ্ন করি'তব নামে;
হাত ধরে নিয়ে চল
তোমার গোপন ধামে!
বিক্ষিপ্ত হৃদয় অনু
বাহিরের শত কাজে;
আপনা হারা'য়ে ফেলি
চঞ্চল বিশ্বের মাঝে।
জীবনের কণা গুলি
নিজ হাতে কুড়াইয়ে;
হে বিধাতা বেঁধে দাও
সুদৃঢ় সংকল্প দিয়ে।
বাসনার সচঞ্চল
মলিন তাড়না আসি;
যেন না উড়ায়ে দেয়
যথা তুচ্ছ তৃণ রাশি!
সংসারের জ্বালা ল'য়ে
কাঁদে মোর এ'পরাণ;
বিষয়ের সুখ ভোগে
নাহি যেন হই ম্লান!
তুচ্ছ মলিনতা মোর
জ্যোতির্ম্ময় তব করে;
অন্তর বাহিরে মম
সর্ব্বঠাঁই দিক ভরে!

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় চৌধুরী।

ভিক্ষা।

—:•:—

তোমারি করুণা শিরেতে ধরিয়া
সাধনার ধন লভিতে;
পাঠায়ে দিয়েছ হে হৃদয় দেব!
তোমারি করম সাধিতে!
চারু হাসি নিয়ে বনে ফুটে ফুল;
স্নেহভরা বুকে ধায় নদীকুল;
তাই হেরি' মোর হৃদয় আকুল,
পারিনা কিছুই জানিতে।
পাঠায়ে দিয়েছ যদিও ধরায়
তোমারি করম সাধিতে!
প্রাতঃ সমীরের মৃদুল কম্পন,
বিহগের চির আকুল কুজন,
প্রকৃতির শুভ স্নেহ সম্ভাষণ,
সকলেই চায় ভুলা'তে!
পাঠায়েছ দেব, যদিও আমায়
জীবন মরণ সভাতে,
বিজয়-মুকুটে মনোহর সাজে,
সুধীরে এসগো হৃদি-কুঞ্জমাঝে,
কর্ম্ম বীণা যেন নব ছন্দে বাজে,
স্বরগ স্বপন জাগা'তে;
ক্লান্ত আবাহনে এস দেব, আজি
বিমল প্রভাত-শোভাতে।

শ্রীরেবতী রমণ নন্দী।

———

পরিমিত-পানাহার।

—:০:—

(Addison এবং Spectator হইতে সঙ্কলিত)

আরব্যোপন্যাসে একটী সোলতানের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। ইনি বহুদিন শারীরিক ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন, বহুবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়াও সুফল প্রাপ্ত হন নাই। অবশেষে, জনৈক চিকিৎসক তাঁহাকে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বনে সম্যকরূপে রোগ-মুক্ত করেন। এই চিকিৎসক একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ফাঁপা বল (Ball) কতিপয় ভেষজ-পূর্ণ করিয়া এমনিভাবে উহাকে বন্ধ করিলেন যেন অভ্যন্তরস্থ কিছুই পরিদৃষ্ট না হইতে পারে, পরে একটী মুদ্গরের হাতল (handle) ও উহার যে অংশ দ্বারা বল (Ball) চালনা করা হয়, সেই অংশটী পূর্ব্বোক্ত রূপে শূন্য করিয়া তন্মধ্যে আরও কতিপয় ভেষজ পরিপূর্ণ করিয়া ইহাকেও পূর্ব্বোল্লিখিত বলের ন্যায় বন্ধ করিয়া দিলেন। তৎপরে চিকিৎসক তদীয় রোগী সোলতানকে প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে স্বেদ-বারি নির্গমন না হওয়া পর্য্যন্ত এই সুগঠিত যন্ত্রদ্বয় চালনা করিয়া ব্যায়াম করিতে উপদেশ দিলেন। ভিষগবরের উপদেশানুসারে ব্যায়াম অনুষ্ঠান করিয়া ব্যাধিক্লিষ্ট সোলতান বহুঔষধাদি ব্যবহার করিয়াও যে পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, এইরূপ প্রক্রিয়ায় অচিরেই তিনি সেই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিকবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

এই প্রাচ্য উপাখ্যানটী আমাদিগকে উজ্জ্বলরূপে দেখাইতেছে যে কায়িকশ্রম স্বাস্থ্যের পক্ষে অতীব উপকারী এবং ব্যায়াম সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ঔষধ। মানবদেহের সাধারণ গঠন ও উহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যন্ত্র নিচয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ সন্নিবেশ হইতেই আমরা মানবদেহ সংরক্ষণ সম্পর্কে ব্যায়ামের অত্যাবশ্যকতা বুঝিতে পারি। এস্থলে, আরও একটী স্বাস্থ্য রক্ষোপযোগী সুন্দর উপায়ের উল্লেখ করিব; এইটী অনেকাংশেই ব্যায়ামের ন্যায় সমান ফলপ্রদ এবং যেখানে ব্যায়াম করিবার সুবিধা না থাকে ইহা সেখানেও বহুলাংশে ব্যায়ামের অভাব দূরীকরণে সমর্থ। আমরা পরিমিত পানাহারের কথাই বলিতেছি। অন্যান্য স্বাস্থ্য-রক্ষোপযোগী উপায় সমূহ হইতে, ইহাতে এই একটী বিশিষ্ট সুবিধা যে পরিমিত পানাহার সর্ব্বত্র, সর্ব্বঋতুতে এবং সর্ব্বাবস্থার লোক দ্বারাই অক্লেশে অনুসৃত হইতে পারে। সকল মানুষই স্বীয় ব্যবসায়ের হানি, অর্থের অপচয় বা নিরর্থক সময় নষ্ট না করিয়াও পথ্যাপথ্য নিয়মের (Regimen) মধ্যে এই নিয়মটীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারেন। যদিও ব্যায়াম দ্বারা সম্ভোগাদির আতিশয্য বিনষ্ট হয়, পরিমিত পানাহার উহার সম্ভাবনীয়তারই প্রতিষেধ করিয়া থাকে; যদি নিয়মিত অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে পাকস্থলী পরিষ্কৃত হয়, পরিমিতাহার উহাকে বহুল তৃপ্তি বা অত্যধিক ভারগ্রস্ততা হইতে রক্ষা করে; যদিও ব্যায়ামানুশীলনে শরীর-রস নিচয়ের উপযুক্ত উদ্দীপনা এবং শোণিত সঞ্চালনের উন্নতি ঘটিয়া থাকে, পরিমিত পানাহার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিধান

করে ও উহার স্বাভাবিক কার্য্য সম্পাদনে সহায়ক হয়; একটী প্রবর্দ্ধমান ব্যাধিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, অপরটী উহাকে শক্তিবিহীন করিয়া ফেলে। অধিকাংশ স্থলেই ঔষধ ব্যায়াম কিম্বা পরিমিত পানাহারেরই প্রতিনিধি (Substitute) মাত্র। সত্য বটে, যে সকল সাংঘাতিক পীড়ায় প্রাগুক্ত স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রকৃষ্ট যন্ত্র দুইটীর মন্থর ফলোপধায়িতার অপেক্ষা করিয়া থাকা চলে না, সে স্থলে ঔষধ ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু মানুষ যদি ব্যায়াম ও পরিমিত পানাহারটাকে নিয়মিতরূপে জীবনের অভ্যস্ত ঘটনায় পরিণত করিয়া তুলে, তাহা হইলে—তৎপক্ষে ঔষধ ব্যবহারের আবশ্যকতা কচিৎ উপলব্ধি হইবে। ফলতঃ আমরা দেখিয়া থাকি, পৃথিবীর যে সকল অংশের লোকেরা পশ্বাদি শীকার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্য সম্পন্ন এবং মানুষেরা যখন মৃগয়া নিরত ছিল ও মৃগয়া-লব্ধ স্বল্প-আহার্য্য ব্যতীত আর কিছুই আহার করিত না, তখনই তাহারা দীর্ঘজীবী হইত।

অলস সুতরাং ব্যায়াম বা শ্রমবিমুখ ও অপরিমিতাহারী মানুষ ছাড়া কদাচিৎ অন্যের শরীরে চুঙ্গী বসাইয়া আরোগ্য মূলক শোণিত মোক্ষণের ব্যবহার লক্ষিত হইয়া থাকে, যেহেতু অপরিমিতাহার হইতে স্বাস্থ্যের প্রতি যে গুরুতর অত্যাচার হয়, তাহার প্রতিষেধক উপায় ব্যতীত, আমাদের মধ্যে যে ঐ সকল অভ্যন্তরীণ প্রয়োগের (চুঙ্গী বসাইয়া দেহ হইতে শোণিত মোক্ষণের) বহুল প্রচলন ঘটিয়াছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার অন্য কারণ নাই। পাচক ও মদ্য-বিক্রেতাগণের বিষময় কুফল নিরাকরণকল্পে ঔষধ বিক্রেতাদিগকে প্রতি নিয়তই ব্যাপৃত থাকিতে হইতেছে। দার্শনিক ডাইওজেনিস Diogenes সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে কোনও একটি ভোজে যাত্রী যুবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর তিনি তাহাকে এমনি ভাবে রাস্তা হইতে ধরিয়া তাহার স্বগৃহে আত্মীয় স্বজনগণ সমীপে লইয়া গিয়াছিলেন যেন তিনি বাধা না দিলে সে ঘোর বিপদে পতিত হইয়া বিপন্ন হইত! বর্ত্তমান সময়ে আহারাদিতে যেরূপ ঔদরিকতা লক্ষিত হয়, এই দার্শনিক তাহা উপস্থিত থাকিয়া দর্শন করিলে কি বলিতেন? তিনি যখন কোনও গৃহ স্বামীকে কুক্কুট, মৎস্য ও মাংস, তৈল, ভিনিগার, সুরা ও মসলা, বিভিন্ন বিংশতি প্রকারের শাক, এক শত উপাদান-নির্ম্মিত চাট্‌নী, বিবিধ মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত মেঠাই এবং রসনার তৃপ্তিদায়ী অগণিত ফলাদি ভক্ষণ করিতে দেখিতেন, তখন তিনি কি তাঁহাকে উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত মনে করিয়া তদীয় ভৃত্যকে তাঁহার হস্ত-দ্বয় বাঁধিয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিতেন না? এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় ও বহুদ্রব্য সম্মিলিত আহারাধিক্য দেহ মধ্যে বিরূপই না বিজাতীয় বেগ ও পরস্পর-বিরোধী উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আমার পক্ষে ত বলিতে পারি, আমি যখনই কোন সুদৃশ্য টেবিলের উপরে জাকজমকপূর্ণ ভোজ সজ্জিত দেখিতে পাই, তখনই উহার মধ্যে অসংখ্য ব্যাধি সহকারে

বাত, উদরী, জ্বর, ও অন্যান্য শারীরিক অবসাদ প্রচ্ছন্ন বেশে অবস্থিতি করিতেছে—সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। সাদাসিধে ও লঘু ভোজনই প্রাকৃতিক। মানুষ ব্যতীত অন্য সকল প্রাণীই এক জাতীয় জিনিস ভোজন করিতে থাকে। কতকগুলি প্রাণী কেবল লতাপাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে; অন্য কতকগুলি মৎস্য খায়, আবার কতকগুলি প্রাণী শুধু মাংস ভোজন দ্বারাই উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষেরা যাহা পায়, তাই খায়; এমন কি একটী ক্ষুদ্রতম ফল অথবা ভূমিজ অব্যবহার্য্য জঞ্জালাদিও বাদ যায় না; তাহাদের বুভুক্ষু জঠর হইতে বেঙের-ছাতা (Mushroom) বা Berry পর্যন্ত কদাচিৎ নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে।

পরিমিত পানাহারের একটা ধরাবাঁধা নিয়ম নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব, কারণ যাহা এক জনের পক্ষে ঔদরিকতার একশেষ, তাহাই আবার অন্যের পক্ষে পরিমিতাহার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে সকল সময়েই এরূপ মানুষ খুব অল্প পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহারা কোন্ জাতীয় খাদ্য ও উহার কত পরিমাণ তাহাদের শারীরিক গঠনের উপ-যোগী হইবে, অনুমান করিতে পারে নাই। আমি যদি পাঠকগণকে আমার রোগী মনে করিয়া তাঁহাদের সকলেরই উপযোগী এবং আমাদের দেশস্থ জলবায়ু ও জীবনধারণো-পায়ের বিশিষ্টরূপে অনুসারী পরিমিত-আহা-রের ব্যবস্থা করিতে বসিতাম, তাহা হইলে আমি জনৈক মনীষী চিকিৎসকের নিম্নোক্ত নিয়মটীরই অনুবর্ত্তন করিতাম :—যথা, এক জাতীয় জিনিসের মধ্যেই ভোজনটা আবদ্ধ রাখিতে হইবে। যদি দ্বিতীয় প্রকারের কোনও পদার্থ আহার করিতে হয়, তাহা হইলে ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও উত্তেজক পানীয় অপেয়; এবং কোন চাট্‌নীই বিশেষতঃ যেগুলি লঘু ও সহজ পাচ্য নহে—তাহা গ্রহণ করা অসঙ্গত। যিনি এই অল্প সংখ্যক স্পষ্ট ও সহজ নিয়ম মানিয়া চলেন, তিনি কখনও ঔদরিক বলিয়া নিন্দিত হইতে পারেন না। কারণ, প্রথমত বিবিধ জাতীয় বিভিন্ন আস্বাদনযুক্ত জিনিসের অভাব বশতঃ তাঁহার স্বাদবোধ অসঙ্গতরূপে লুব্ধ হইবে না, ফলে অপরিমিতাহার ঘটিবারও সম্ভাবনা অল্প হইবে; দ্বিতীয়তঃ অতি ভোজনের সাহায্যকারী ও কৃত্রিম উপায়ে ক্ষুধাবৃদ্ধিকারী চাটনী প্রভৃতিরও অভাব রহিয়া যাইবে। আর আমাকে যদি পানাদি (Drinking) সম্পর্কে কোনও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে উহা স্যার উইলিয়ম টেম্পল কর্তৃক উদ্ধৃত নিম্নোক্ত প্রবচনটীর উপরেই অবস্থিত রহিবে; যথা :—প্রথম পাত্র আমার নিজের জন্য, দ্বিতীয় পাত্রটী বন্ধুদিগের নিমিত্ত, তৃতীয়টী মানসিক স্ফুর্ত্যার্থে ও চতুর্থ পাত্র আমার শত্রুদের জন্য। কিন্তু সংসারী মানুষের পক্ষে সর্ব্বদাই ঈদৃশ দার্শনিক হিসাবে পানাহারাদি নির্ব্বাহ করা অসম্ভব বলিয়া আমাদের মতে প্রত্যেকেই স্ব স্ব শারীরিক গঠনানুসারে উহার বিরোধী ভোজ্যাদি গ্রহণ হইতে বিরত রহিতে পারেন। ইহা দ্বারা প্রকৃতির বড়ই সহায়তা হইয়া থাকে; কারণ যখন কর্ত্তব্যানুরোধ কিম্বা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া তাহাকে গ্লান-

ভোজনাদি ত্যাগ করিতে হয়, তখন ইহা প্রকৃতির ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহিয়া থাকা সম্পর্কে খুব সাহায্য করে ; আবার ইহা দ্বারা তাহার ভারগ্রস্ততা হইতে মুক্ত হওয়ার ও বৃহৎ পাকস্থলীর কার্য্যকারী শক্তি ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কল্পে প্রকৃতি বিশিষ্ট সুযোগও পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যথোপযুক্ত সময় হইতে পানাহারে এইরূপ সংযম অবলম্বন করিলে, উহা ব্যাধিকে প্রারম্ভেই ধ্বংস করে এবং উহার মূলবীজটা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলে। দুই তিন জন প্রাচীন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—এথেন্স নগরের যে মহামারী কত যুগ পর্য্যন্ত লোকের ভীতি উৎপাদন করিয়াছে ও যাহার কথা বিভিন্ন সময়ে বহু মনীষী লেখকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বগ্রাসী মড়কের প্রবলতা সময়েও সেই স্থলে বাস করিয়া শক্রেটিস বিন্দুমাত্রও সংক্রামিত হন নাই। উক্ত গ্রন্থকারেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন সক্রেটিস্ যে সুনিয়মিত ও নিরুপদ্রত পরিমিত পানাহার পালন করিতেন, তাহাই তাহাকে ঐ সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

* * * *

দীর্ঘ জীবন লাভ সম্পর্কে পরিমিত পানাহারের উপকারিতাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উদাহরণ নিউইস কর্ণেরো প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেখিয়াছি ; এ স্থলে একটু উল্লেখ করিয়াই আমাদের বিবৃতি শেষ করিব। এই পুস্তক প্রণেতা পূর্ব্বোক্ত কর্ণেরো প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভগ্ন স্বাস্থ্য ছিলেন ; কিন্তু সেই সময় হইতেই খুব দৃঢ়তা সহকারে পরিমিত পানাহারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার রুগ্ন ও দুর্ব্বল স্বাস্থ্যকে এমনি ভাবে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন যে "দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভের নিশ্চিন্ত উপায়" নামে যে পুঁথিখানি ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে, তিনি অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ঐ খানা প্রণয়ন করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই উক্ত পুস্তিকার তৃতীয় কি চতুর্থ সংস্করণ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি শতাধিক বর্ষ বয়সের পরে কোনও ক্লেশ বা যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া যেন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছেন—এরূপ অক্লিষ্ট অবস্থায় পরলোকে গমন করেন।

শ্রীভূপতি চরণ চক্রবর্ত্তী।

নাটক ও নভেলের সৃষ্টি
এবং
রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয়।

—:•:—

এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার সারতত্ত্ব প্রাচীন কালে প্রায় সকল লোকই বুঝিতেন। দুই একজন যাহারা না বুঝিতেন, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য কোন ক্লেশ পাইতে হইত না। এখন একশ্রেণীর লোক মাথা খাড়া করিয়াছেন, তাহাদের ওজন বোধ নাই, কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিচার নাই, ভাব নাই, চিন্তাশীলতা নাই, আছে কেবল যুক্তি-প্রমাণবিহীন তর্কাভ্যাস ও দুর্নিবার্য্য যশোলিপ্সা। এজন্য তাঁহারা যাহা বুঝেন, তাহা যদি অযুক্তিকরও হয়, খাঁটি না হয়, ধর্ম্মবিরোধী হয়, তাহা হইলেও উহার ভ্রম সংশোধন ত দূরের কথা, উৎকৃষ্ট বোদ্ধাদেরও

কার্য্যপ্রণালীর দোষারোপ করিয়া তাহাদের প্রতিভা খর্ব্ব করিতে চাহেন, নিজেরা এমন একটা কিছু গড়িতে পারেন না, যাহা ঐ সব মনস্বী লোকের চিন্তার ও অনুকরণের বিষয়ীভূত হয়। যে মন্তব্য স্বাধীন চিন্তা ও অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে মন্তব্য আমাদের শিরোধার্য্য। কিন্তু যাহা কেবল স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির পরিপোষক, তাহার মূলে স্বাধীন চিন্তা থাকিলেও যুক্তি কোথায়? যাহার মন্তব্যে যুক্তিকারিতা নাই, তাহার মন্তব্য সকল শ্রেণী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইতে পারে না। আমরা অযুক্তিকর কথা শুনিতে ভাল বাসি না। বরং মনে করি যে, যেখানে যুক্তিবিহীন মন্তব্য সেখানেই স্বেচ্ছাচারিত্বের প্রশ্রয় দেওয়া কখনই সঙ্গত নহে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে নাটক ও নভেল আমাদিগকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতে পারিতেছে না, পরন্তু সমাজে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিতেছে। যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের সভাপতি হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সর্ব্বশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয় সাহিত্য সম্মিলনীর বিগত অধিবেশনে বলিয়াছিলেন যে, যেরূপ সেক্‌সপীয়র, মিলটন, ও বায়রণের বিশ্ববিমোহিনী প্রতিভা শুধু ইউরোপ খণ্ডে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গসাহিত্যসেবীদের রচনা কেবল বঙ্গদেশে কেন, সর্ব্বত্র যাহাতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে; বলা বাহুল্য যে, যাহাদের প্রতিভা সারদা বাবু সর্ব্বত্র ছড়াইয়া তত্রত্য লোকদিগকে চমৎকৃত করিতে চাহেন, সে সব প্রতিভাবান লোকই নাটক ও নভেল প্রণেতা। সারদা বাবুর এ ভবিষ্যদ্বাণী যে ফলিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতের লোকের প্রতিভা যে অন্য দেশবাসীদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছে, তাহার প্রমাণ ভারতের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শকুন্তলার বহু ভাষায় অনুবাদ। যাহারা শকুন্তলার তত্ত্ব ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই উপরোক্ত নাটক ও নভেল রচয়িতাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রয়োগ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে ইহাদের কাহারও কাহারও পুস্তক বিদেশীয় ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। বঙ্গীয় কবিদের নাটক ও নভেল পাঠের জন্য বিদেশীয় মণীষীগণ এত লালায়িত কেন, আর কেনই বা আমাদের দেশীয় চিন্তাশীল লোক এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী বিদ্যাম্মণ্ডলী এই সব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সার তত্ত্ব বাহির করিতেছেন ও নিজেরা লিখিয়া বঙ্গভাষায় কলেবর পরিপুষ্ট করিতেছেন? ইঁহারা কি প্রকৃতই বাতুল, না ইহাদের এ কার্য্যে প্রকৃত মহত্ব আছে? আমরা নাটক ও নভেল পাঠের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই "আলোচনা" পত্রিকায় ১৩ ৪ সালের ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, পাঠকবর্গকে ঐ সংখ্যা একবার পাঠ করিয়া সম্যক উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি।

যাহাদের বিচারশক্তি পরিমার্জ্জিত হয় নাই, তাহারাই উৎকৃষ্ট নাটক ও নভেলের উপর

দোষারোপ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ৺ দামোদর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"যাহারা নাটক ও নভেলের রসাস্বাদন করিতে গিয়া চরিত্র কলুষিত করিয়া ফেলেন, তাহাদের গৃহস্থাশ্রমে বাস করার ব্যবস্থা সঙ্গত হয় নাই"। আমরাও এ স্থলে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, উৎকৃষ্ট নাটক ও নভেলের কোন অংশই খারাপ উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই, যাহারা কবির উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া কলুষিত হয়েন, তাহাদের জন্য কি কবিগণ দায়ী। এখন দেখা যাউক, আমাদের দেশে নাটক ও নভেলের সৃষ্টি কোন সময় হইতে আরম্ভ। এই দেশে অতি প্রাচীন কালে মহাভারত ও রামায়ণ সর্ব্বত্রই সাদরে পঠিত হইত। মহাকবি ভবভূতি উত্তর চরিতে বলিয়াছেন যে, মহামুনি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া উহা অভিনয়ের জন্য ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন, পাঠকগণ এখানে এই পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিবেন যে, নাটক অভিনয় যে আজকালই প্রচলিত এমন নহে, উহা অতি প্রাচীন কালেও অভিনীত হইত, এবং ইহার অভিনেতা ছিলেন, সংসার পরিত্যক্ত অরণ্যবাসী ঋষিগণ।

অনেকে বলিবেন—যে রামায়ণ ও মহাভারতের অভিনয় বরং সমর্থন করা যায়, নাটক ও নভেলের অভিনয় সমর্থন করিব কিরূপে? নাটক ও নভেলের সৃষ্টি কাল সম্বন্ধে এখানে সুসংক্ষেপে দুই একটি কথার অবতারণা করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ মহাশয় বলিয়াছেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত এক এক খানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। একে একে উহা পাঠ করার জন্য বিস্তর সময়ের আবশ্যক, তাহার উপর আবার উহাতে কাট-ছাঁট নাই, সকলই যেন একঘেয়ে। যেখানে যেটুকুর বর্ণনায় পাঠকের চিত্তরঞ্জিত হইত, সেখানে সে টুকুর বর্ণনা নাই। যেস্থান পরিত্যাগ যোগ্য, সেস্থানের বর্ণনা প্রাচুর্য্য পাঠককে বিরক্তি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে যখন ক্রমান্বয়ে পাঠকবর্গের বুদ্ধিবৃত্তি ও সৌন্দর্য্য পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল, বিচার শক্তি সম্প্রসারিত হইল, তখন পাঠকবর্গ সুন্দর সুন্দর কার্য্য চাহিলেন, মহাকবিগণ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি উপজীব্য করিয়া উহার কার্য্যাদি পাঠকবর্গকে উপহার দিলেন, ইহার পর পাঠক বর্গের রুচি আরও মার্জ্জিত হইল, তাহারা বুঝিলেন—যে কবির শক্তি মনুষ্য হৃদয়ে অপরিসীম, তাহারা লোককে ধর্ম্মে উত্তেজিত করিতে পারে, সাধারণকে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে পারে, এইজন্য তাহারা ধর্ম্মানুশীলনের জন্য দৃশ্যকাব্য ও নাটকাদি চাহিলেন।

যশোবর্ম্মদেব কবিদের ধর্ম্মরাজ্যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইলেনও সেই সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিলেন। এমন কি প্রধান প্রধান নয় জন কবি লইয়া তিনি "নবরত্ন" সভা গঠন করিলেন, ঐ সভায় প্রায় সকল পারিষদই নাটক রচয়িতা। ইংলণ্ডেও এই প্রকৃতির সভা আছে, ঐ সভায় সভ্যদিগকে "রয়েল বার্ড" বলে।

বিদেশীয় কবিদের ন্যায় আমাদের দেশীয়

কবিমণ্ডলী রাজকীয় উৎসাহ বা সাহায্য পান না। তাঁহারা অতি কষ্টে কাব্যালোচনা করেন ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার সেবা করিয়া ধন্য বোধ করেন। একখানি সৎগ্রন্থ পাঠ করা অপেক্ষা সেই পুস্তকের বিষয়গুলি প্রত্যক্ষীভূত হইলে তাহা লোকের হৃদয়ে কিরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহা পূর্ব্বকালে ঋষিগণ বুঝিতেন রাজা এবং দর্শকমণ্ডলী ও বুঝিতেন। যে সময় শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয়, সে সময়টা যে বিশেষ সৌভাগ্যের তাহা ঐতিহাসিকগণও বুঝেন। বিদেশীয় কবি সেক্‌সপীয়রের আবির্ভাব কালে মহামান্যা এলিজাবেথ রাজত্ব করিতেছিলেন, তিনিও তাঁহার আবির্ভাবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, কবির অসাধারণ প্রতিভা কেবল সামান্য লোকের হৃদয়ে কার্য্য করে না, উহা দরিদ্রের ধনীর ও যোগীর হৃদয়েও কার্য্য করিয়া থাকে। কেবল বক্তৃতায় যাহা সাধিত না হয়, অনুসন্ধানে যাহা আবিষ্কৃত না হয়, একটি অভিনয় দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইয়া থাকে। মানব হৃদয়ে অভিনেতাগণ দ্বারা কবি কি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহা দেখুন, দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকে আত্মহারা হউন।

মহাকবি সেক্‌সপীয়রের হ্যামলেট একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যাহারা হ্যামলেট পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে হ্যামলেট যখন ডাকিনীর নিকট শুনিতে পাইলেন যে, তাহার জননী দুশ্চরিত্রা, ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য সে তাহার ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বামীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে, এবং তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে তাহার দেবর Clandius এর অঙ্কশায়িনী হইয়াছে, দার্শনিক হ্যামিলটন কেবল ডাকিনীর কথায় এই ভয়াবহ ঘটনা বিশ্বাস করিয়াই তাহার জননীর এই জঘন্য কার্য্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না, তিনি এইরূপ একটি ঘটনা উপজীব্য করিয়া নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিলেন এবং অনুসন্ধানে রহিলেন, তাহার জননী ও খুল্লতাতের সেই অভিনয় দর্শনে চিত্তের কিরূপ ভাব ফুটিয়া বাহির হয়। বলা বাহুল্য যে হ্যামলেটের এই কৌশল অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রসূ হইল।

হ্যামলেটের জননী ও Clandius সেই অভিনয়ে যখন অভিনেতাগণকে তাহাদের ন্যায় নিষ্ঠুর কার্য্যে ব্রতী দেখিলেন, তখন স্বকীয় পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া সেই স্থান অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন। সেই সময় Clandıs তাহাদের উৎকট পাপের জন্য কিরূপ অনুতাপ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। হ্যামলেট পাঠক স্মরণ করিয়া দেখিবেন যে, নাটক অভিনয় দ্বারা লোকের চিত্ত কিরূপ পরীক্ষিত হয়। লোককে হাসাইতে কাঁদাইতে, ধর্ম্মে উত্তেজিত করিতে, পাপীকে মর্ম্মপীড়িত করিতে অভিনয় কতদূর শক্তিমান, তাহা যে এখানে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছি, ইহাও লজ্জার বিষয়। যে হ্যামলেট Clandius ও তাহার জননীর চিত্ত পরীক্ষার জন্য অভিনয় কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে হ্যামলেট যেমন তেমন পুরুষ নহেন, তিনি এক জন প্রধান দার্শনিক। যে মহাত্মা বলিয়া-

ছেন।—There are more things in Heaven Horatio
Than are dreamt of in yur Philosophy.
যে মহাপুরুষ গাহিয়াছেন ;—
But that the dread of something after death
The undiscover'd cuntry from house bowrn,
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied over with the pale cast of thought,
And enterprises of great pitch and moment
With this regard their currents turn away,
And lose the name of Action.

যে দার্শনিকের এই অমৃতময়ী উক্তি তিনি মেক্সই হউন, বা অন্য কেহ হউন, তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের সহস্র প্রণাম। অভিনয় দ্বারা যে অনেক সময় অনেক গূঢ় রহস্য পরিস্ফুট হয় তাহা Hamlet এর এই অভিনয়েই সপ্রমাণ হইয়াছে। তোমরা বলিতেছ যে অভিনয় না করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিলেই চলে বক্তৃতায় যে অভাব পূরণ করিতে পারে না, অভিনয়ে যে তাহা পূরণ করিতে পারে, তাহা যিনি সেক্‌সপীয়ারের Julius Cæzar পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবগত আছেন। Antonio অসাধারণ বক্তা হইয়াও ব্রুটাসের বিরুদ্ধে সকলকে দাঁড় করাইবার জন্য কেন দৃশ্যাবলীর সাহায্য লইয়াছিলেন? কেনই বা তাঁহার মৃতদেহ দর্শকবর্গের নয়নের সম্মুখে ধরিয়া তাঁহার গুণগরিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন?

যিনি অসাধারণ বক্তা তিনিও মানবহৃদয়ে প্রবেশ করার পক্ষে অভিনয় যে একটা উৎকৃষ্ট পন্থা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গের প্রতিভাবান মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত মহাশয়ের জীবন চরিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে মহাত্মা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর K. C. S. I. মহাশয়ের বাগান বাটীতে মধুসূদন থিয়েটার পার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন, আমার যেন মনে হয় তিনি সেখানে অভিনয় করার জন্যই শর্ম্মিষ্ঠা নাটকখানি প্রকাশ করিয়াছেন, যতীন্দ্র মোহন, সুপণ্ডিত গৌরদাস বসাক ও প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নাটক রচয়িতাগণ দ্বারা অনেক সময় সমাজের প্রভূত উপকার হয়। ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার সুপ্রসিদ্ধ অমৃতলাল বসুর বিবাহ বিভ্রাট পুস্তকখানি যখন বাহির হয় তখন চতুর্দ্দিকে তাঁহার যশোরাশি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় নবজীবনে একটী সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, 'বিবাহ বিভ্রাট' পুস্তকখানির অভিনয়ের সুফল আমাদের সমাজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়াছিল। কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবু সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্যই "বীণা" নাট্যশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। মানবজীবন তত্ত্ব-

বিশারদ সেক্সপীয়র সেই উদ্দেশ্যেই লণ্ডনে কোন থিয়েটার পার্টির ম্যানেজার ছিলেন। আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে আমাদের বঙ্গের নাটক গুরু দীনবন্ধুর নীলদর্পণ যখন ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হইত, তখন একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই অভিনয়ে হিন্দুমহিলার প্রতি ম্লেচ্ছের অত্যাচার দেখিয়া রোষে চটিজুতা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় এরূপভাব উদ্বুদ্ধ করা সহজ নহে, ২।১ জন ভিন্ন কেহ পারিয়াছেন বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস নাই। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের Impeachmentএ বার্ক কতকটা পারিয়াছিলেন।

তোমরা ধর্ম্মকার্য্য কাহাকে বল? যে উপায়ে পুণ্যাত্মার পুরস্কার হয়, পাপীর দণ্ড হয়, যে উপায়ে অধার্ম্মিককে ধর্ম্মে উত্তেজিত করে, যে উপায়ে সাঙ্কোচিত বৃত্তিগুলি সম্প্রসারিত করে, যে উপায়ে আদর্শের দিকে মনোবৃত্তিগুলি সঞ্চালিত হয়, যে উপায়ে সমাজের দোষগুণগুলি নিরপেক্ষভাবে আলোচিত হয়, সে উপায় অবলম্বন যদি তোমরা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে কর, তবে কিরূপে ধর্ম্মার্জ্জন করিবে? কবি সত্য ঘটনামূলক কাব্য রচনা করুন বা অলীক কল্পনা দ্বারা কাব্যরচনা করুন, তাহার সৃষ্ট চরিত্রে আদর্শের গুণাবলি বিভাসিত হইবেই। যেখানে আদর্শের অনুরূপ সৃষ্টি সেখানেই ধর্ম্ম, এই জন্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য মিল বলিয়াছেন:—

The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions towards the Highest excellence which is paramount over selfish desires.

তবে কিরূপে আমাদের আবেগ Emotions ঈশ্বরের দিকে বা Highest Excellenceএর দিকে ছুটিয়া যাইবে, তাহার উপায় অনুশীলন। তোমরা যদি ধার্ম্মিক হইবার ইচ্ছা কর, যেথানে ঐ সব বৃত্তি উন্মেষ দেখিতে পাইবে, সেখানেই তোমাদের আবেগ উদ্বুদ্ধ হইবে, আচার্য্য Shelly বলিয়াছেন The Substance of Religion is Culture. আমরা এ বাক্যে বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাই যে কার্য্যে বৃত্তিগুলির অনুশীলন হয়, সেই কার্য্যই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অনুশীলন ভিন্ন যে আবেগ উপস্থিত হয় না, একথা বুঝাইতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইবে।

তোমরা এইমাত্র স্মরণ রাখিবে যে ঈশ্বর সর্ব্বগুণাধার, তাহার মধ্যে সকল গুণই অনন্ত। আমাদিগকে সেই অনন্ত গুণ উদ্ভাসিত করিতে হইবে, নতুবা ধর্ম্মানুশীলন হইবে না। এজন্য যেখানে জ্ঞান শিক্ষা পাইব, যেখানে ভক্তি শিক্ষা পাইব, যেখানে সত্যের সম্মান দেখিব, চিত্তস্ফূর্ত্তিকর সুন্দর বিষয় পাইব, তাহারই আলোচনা করিব। আমাদের ঈশ্বর জ্ঞানের ভিতর। একথা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় বুঝিতেন, তাই তিনি একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন; একথা আরও দুইজন মহাপুরুষ জানিতেন, রোমের সিসিরো ও গ্রীসের সক্রেটিস। তাই তাঁহারা এক এক একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। আরও বলিতেছি যাঁহারা কাব্য ও নাটক প্রণেতা তাঁহারা সামান্য পুরুষ নহেন। অলঙ্কার শাস্ত্রকার বিশ্বনাথ তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়াছেন:—

কাব্যালাপশ্চ যে কোচিত গীত কানাখিলানিচ
শব্দমূর্ত্তিধর স্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ।
যে কিছু কাব্যালাপ এবং সঙ্গীত তাহাই শব্দ-মূর্ত্তিধর মহাত্মা বিষ্ণুর অংশ।

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহাত্মা ৺ প্রিয়নাথ সেন এম, এ, ডি, এল "অদ্বৈতবাদ বিচার" পুস্তকে ঐক্যানুসন্ধান প্রবন্ধে কাব্য সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন শুনুন।

"ক্রমাভিব্যক্তিই জগতের প্রতিষ্ঠিত রীতি। মানববুদ্ধি যখন পরিদৃশ্যমান বস্তু সমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাৎপর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হয় তখন উহা প্রধানতঃ দ্বিবিধ ভাবে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ গতি দ্বিবিধ যুগের অবতারণা করিয়া থাকে—

প্রথম কাব্যযুগ, দ্বিতীয় দর্শনযুগ। কাব্যে যাহার আরম্ভ, দর্শনে তাহার পরিণতি। উহাই জ্ঞান বিকাশের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম।"

ঐ সব মহাপুরুষের সঙ্গে তোমাদের মতের অনৈক্য হওয়ার বিস্তর কারণ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে যে উঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেন না, এবং কাব্যের তত্ত্ব তোমাদের অপেক্ষা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। তোমরা জীবনের কতকটা অংশকে ধর্ম্মজীবন মনে করিয়া আর কতকটা অংশকে বৈষয়িক বা Secular জীবন মনে করিয়া থাক, তাই তোমারা বুঝিতেছ না যে যাঁহারা কাব্য রচনা করেন তাঁহারা পরিদৃশ্যমান বস্তু সমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই তৎপর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং উহা দ্বারা জ্ঞানদানেই ব্যাবাধিত হইয়া থাকেন। এবং যাঁহারা উঁহার সেবা করেন, অভিনয় দ্বারাই হউক বা অন্যবিধ উপায় দ্বারাই হউক সেই সেবা দ্বারা মহাশক্তিরই অর্চ্চনা হয়।

যিনি ধর্ম্মালোচনা করিতে গিয়া Unity বা ঐক্যানু সন্ধানে বিরত হয়েন, তাহাদের ধর্ম্মে যুক্তি কোথায়?

To renounce the search for unity would be for reason to renounce reason itself (Critical Philosophy of Kant)

জ্ঞান সম্বন্ধে ঐক্যানুসন্ধানে বিরত হওয়া আর জ্ঞানকে পরিত্যাগ করা একই কথা। এ সব বিষয় একটু কঠিন, এ স্থলে ইহার সমালোচনা না হওয়াই ভাল ছিল, কিন্তু কাব্যের দ্বারা সে Unity বা ঐক্যানুসন্ধান হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য এই কথাগুলি বলিলাম যাহাদের মতে ঐক্যানুসন্ধান বা Unity ধর্ম্ম নহে, তাহাদের মতে কাব্যালোচনা পাপের কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু যাহার Reason বা যুক্তি আছে, সে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া তাহার পর্য্যালোচনা করার জন্য কাব্য ও নাটক বা দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিবেই। এই জন্যই অলঙ্কার শাস্ত্রকার বিশ্বনাথ পণ্ডিত কাব্যশাস্ত্রের এত উচ্চ স্থান দিয়াছেন। আমরাও বলিতেছি নাটক ও নভেল অভিনয় ধর্ম্মবিরোধী নহে। উহাদের রচয়িতৃগণ এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিয়া সেই মহাশক্তির চিদাভ্যাস প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান। যাহারা অভিনেতা তাহারা সেই গ্রন্থকারগণের কার্য্যের সহায়ক মাত্র। পরিদৃশ্যমান বস্তু সমূহে আকৃষ্ট হইয়া তাহার পর্য্যালোচনার ফল সে সমস্ত

কাব্য বা নাটক। সেই সময় উহা অভিনয়ে যাহারা দোষ দেন, তাহারা নাটক বা কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই বুঝেন নাই।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী।

(প্রবন্ধ লেখককে] "এমেচার পার্টিতে" কবি দ্বিজেন্দ্র বাবুর রাণাপ্রতাপ অভিনয় করিতে দেখিয়া কেহ কেহ উহা অধর্ম্মকার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, প্রবন্ধ লেখক উহার প্রতিবাদ করিয়া বিগত ৬ই বৈশাখ এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন।)

সম্পাদক।

দস্যুদলন বা অদ্ভুত গোয়েন্দা

—:০:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব কথা।

বঙ্গদেশে ইংরাজ-রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান দস্যুবৃত্তি করিতেন। তাঁহারা স্বয়ং দস্যুতা না করিলেও, অর্থব্যয় করিয়া, দস্যুর দল রাখিতেন। কেহ কেহ এই সকল দস্যুর কল্যাণেই ভাবী বংশধরদিগের জন্য জমিদারী রাখিয়া গিয়াছেন।

কালাচাঁদ সিংহ কায়স্থের সন্তান; কিন্তু এইরূপ দস্যু। তাঁহার দলে অনেক লোক ছিল; তিনি স্বয়ং দস্যুতা করিতেন। কালাচাঁদ কোথাও দস্যুতা করিতে গেলে সহজে কাহারও প্রতি উৎপীড়ন করিতেন না। কেহ তাঁহার কার্য্যে গুরুতর ভাবে বাধা প্রদান না করিলে তিনি তাহার প্রতি শাস্তি বিধান করিতেন না। তবে তিনি অনেক সময়ে অর্থ লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে মনোনত যুবক বা বালক দেখিতে পাইলে তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিতেন। শেষে তাহাকেও দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিতেন।

দস্যু হইলেও কালাচাঁদের হৃদয়ে মানবসুলভ কোমল চিত্তবৃত্তিগুলির অসদ্ভাব ছিল না। পরোপকারী ও দরিদ্রের সহায় বলিয়া এই দস্যুর খ্যাতি ছিল। তাঁহার বাসস্থান কোথায়, কেহ তাহা জানিত না; কিন্তু নিতান্ত বিপদে পড়িয়া যে কালাচাঁদকে ডাকিয়াছে, যে ব্যক্তি দশ জনকে কালাচাঁদের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এক পক্ষ কালের মধ্যে কালাচাঁদ তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। রোগীর সেবা করিয়া অন্নক্লিষ্ট জনের অন্নসংস্থান করিয়া দিয়া অসমর্থের অর্থকষ্ট দুর করিয়া তিনি বড়ই তৃপ্তিলাভ করিতেন। তাঁহার নাম শুনিলে কেহ বা কাঁপিত, কেহ বা যুক্তকরে ভগবানের নিকট তাঁহার কল্যাণ কামনা করিত।

শুনা যায়, দলুই বাজারের কোন দীন ব্রাহ্মণ সন্তান পিতৃশ্রাদ্ধের সময় জমিদারের শরণাপন্ন হন; কিন্তু জমিদার ব্রাহ্মণ কুমারকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইলে ব্রাহ্মণ কুমার সজল নয়নে নিজের কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তিল তণ্ডুলের দ্বারাই পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন, এইরূপই স্থির করেন। এই কথা কালাচাঁদের কোন শিষ্যের কর্ণগোচর হয়। বর্দ্ধমান ও হুগলি জেলায় অনেক স্থানেই কালাচাঁদের চর ছিল।

কালাচাঁদের শিষ্য কালাচাঁদকে সকল

বিষয় নিবেদন করিলে তিনি এক দল দস্যুকে জমিদার বাটী লুণ্ঠন করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধের উপকরণাদি ও যথেষ্ট অর্থ লইয়া ব্রাহ্মণ কুমারের কুটীরে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ কুমারকে কোন কথা না বলিয়া তিনি দ্রব্য সম্ভার ও অর্থ তাঁহার দ্বারে রক্ষা করিয়া চলিয়া যান। এদিকে দস্যুদল জমিদারের বাটী আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট ধনরত্ন সংগ্রহ করে, কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তৎসমুদায় জমিদারের গৃহের দ্বারদেশে রাখিয়া আসেন। পরদিন প্রাতঃকালে জমিদার বাটীতে ডাকাতি ও ব্রাহ্মণ তনয়ের সাহায্যের কথা যখন প্রকাশ পাইল, তখন সকলেই বুঝিল এ কার্য্য কালাচাঁদের। জমিদার তখন নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং উদ্‌যোগী হইয়া ব্রাহ্মণ তনয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করাইলেন।

দস্যুদলের সকলেই কিছু কালাচাঁদ ছিল না। কেহ কেহ কালাচাঁদের অজ্ঞাতসারে লোকের উপর উৎপীড়ন এবং গোপনে পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। কালাচাঁদের দলের কেহ কেহ এইরূপে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শেষে যেখানে যে ডাকাতি হইত, দস্যুকর্ত্তৃক যেখানে কেহ উৎপীড়িত হইত, সেই খানেই লোকে বলিতে লাগিল—কালাচাঁদের দলই ইহা করিয়াছে; কালাচাঁদ করিয়াছে, এমন কথা কেহ বলিত না। এইরূপ দুর্নাম কালাচাঁদের অবিদিত রহিল না। তিনি গোপনে তাঁহার সহচরদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। পরিশেষে একে একে পাঁচ জন সহচরের শিরশ্ছেদন করিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই দস্যুর উপদ্রবের কথা ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইল। বারংবার অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ দস্যুদমনের ব্যবস্থা করিলেন।

চুঁচুড়ায় তখন কর্ণেল বেনসন্ ফৌজদার ছিলেন। তিনিও দস্যুদমনে কৃতসংকল্প হইলেন। অমলেন্দু তৎকালে ইংরাজের অধীনতায় গোয়েন্দাগিরি করিতেছিলেন। মিঃ বেনসন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"বাবু! কে কালাচাঁদ ডাকাত আছে, সে বড় অত্যাচার করিতেছে; তাহার দলকে পাকড়াও করিতে হইবে। আমি তোমাকে এই কার্য্য দিতে চাই।"

অমলেন্দু বলিলেন—আমি শুনিয়াছি কালাচাঁদ উৎপীড়ক নহে; তাহার দলের কেহ কেহ উৎপীড়ন করিতেছে। যাহা হউক, আপনি যখন বলিতেছেন, তখন আমি দস্যুদিগের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।"

অমলেন্দু সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজের আবাসে গেলেন। কালাচাঁদ দস্যু হইলেও কালাচাঁদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। দস্যুদমনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে সে দিবস তাঁহার অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি কর্ণেল বেন্‌সন্‌কে জানাইলেন যে চুর্ণির মুখে কয়েকদিনের মধ্যে ৩।৪ বার নৌকালুণ্ঠন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার বিশ্বাস, এ কার্য্য কালাচাঁদের দলের লোকে করিয়াছে। তিনি নৌকালুণ্ঠনের তদন্তে গমন করিবেন বলিয়া সাহেবের নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ প্রার্থনা করিলেন।

সাহেবের অনুমতিক্রমে আট জন বোটে সমেত একখানি ছিপ প্রস্তুত হইল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ অমলেন্দু ছিপে আরোহণ করিলেন, তখন বেলা ১১টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ত্রয়োদশীর জোয়ারে ছিপ ভাসিয়া চলিল; পাল তুলিয়া দেওয়া হইল; ছিপ দ্রুত ছুটিল।

ছিপ কোথায় যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অমলেন্দুর আদেশ অনুসারে মধ্যে ছিপ তীরে লাগান হইতেছে; অমলেন্দু ক্ষণকালের জন্য তীরে উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন; আবার ছিপে উঠিতেছেন—ছিপ ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। সন্ধ্যার সময় আকাশে মেঘ উঠিল। অমলেন্দু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন গঙ্গায় কোথাও কোন নৌকা নাই। এক জন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কোন্ স্থান?"

মাঝি উত্তর করিল, "কালীগঞ্জ।"

"ছিপ লাগাও" বলিয়া অমলেন্দু ছিপের ছাদে আসিয়া বসিলেন। ছিপের বাহিরে লণ্ঠন জ্বলিতেছিল; অমলেন্দু সেই আলোক ভিতরে লইয়া যাইতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অমলেন্দু একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রাম কতদূরে?"

"৩।৪ রশি হইবে।"

"বর্ষার মেঘ উঠিতেছে না কি?"

"সেইরূপ দেখিতেছি; এ পর্য্যন্ত একদিনও বৃষ্টি হয় নাই, এ মেঘে জল হইলেও হইতে পারে।"

"তোমরা আহারের ব্যবস্থা কখন্ করিবে?"

"যে কারণে আসিয়াছেন, তাহার জন্য আরও দুই এক প্রহর অপেক্ষা করিতে হইবে। আমরা সময় বুঝিয়া আহারের যোগাড় করিব।"

"বেশ" বলিয়া অমলেন্দু তাহাকে বিদায় দিলেন। অন্ধকারে দূরবর্ত্তী স্থান লক্ষ্য হইবে না বুঝিয়া অমলেন্দু আপনমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি ১ প্রহর অতীত হইল; অমলেন্দু দেখিলেন দূরে একটা আলোক দেখা যাইতেছে। আবার মাঝিকে আহ্বান করিলেন। "ঐ আলোক কোথা হইতে আসিয়াছে?"

"ঐ স্থানে শব-দাহ হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ তাহারই আলোক।"

"ভুল; নৌকা আসিতেছে; ছিপ খোল।"

বিদ্যুতের আলোকে মাঝিও বুঝিল নৌকার আলোক। সে বলিল—"নৌকা এই দিকেই আসিতেছে; এতক্ষণ এই আলোক ছিল না, এখন দেখা যাইতেছে—নৌকা এই দিকেই আসিবে। হয় ত ঝড় উঠিবে।"

"যদি সেই নৌকাই হয়, তাহা হইলে এদিকে আসিবে না; তাহারা সাবধানতার সহিত নৌকা চালায়"।

মাঝি পুনরপি বলিল, "ঝড় উঠিবে।"

"প্রাণের মায়া করিও না; মারা যায় দুই খানি নৌকাই যাইবে; আমাদের ছিপ ভাল, আগে তাহারা যাইবে; তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। তীরে তীরে চল।"

মাঝি ছিপ্ খুলিল; পাল তুলিল না; দাঁড় বাহিয়া চলিল। অমলেন্দু ছাদের উপরেই

রহিলেন ; দেখিলেন আলোক ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইতে লাগিল।

অমলেন্দুর ছিপ্ তীরে তীরে চলিল ;- কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই মাঝি বলিল, "ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে, বোধ হয় এখনই ঝড় হইবে।"

অমলেন্দু দূরবর্ত্তী আলোকের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন ; মাঝির কথার কোন উত্তর দিলেন না ; মাঝিও পুনরপি কোন কথা বলিল না। ছিপ চলিল ; অল্পক্ষণ পরেই ঝড় উঠিল ; ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হইতে লাগিল। মাঝি বলিল, "ভিতরে যান"।

অমলেন্দু অন্ধকারে ঘাড নাড়িয়া বলিলেন, "আলোক নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এখন ভিতরে যাওয়া হইবে না। নৌকা কত দূরে হইবে ?"

"নিকটেই আসিয়াছে।"

"আমাদিগকে দেখিতে পাইবে কি ?"

"বিদ্যুতের আলোকে দেখিতে পারে, নৌকা নিকটে আসিয়াছে।"

"এইবার ছিপ লাগাও। চারিজন পুলিশের বেশ ধর ; সময় বুঝিয়া তাহারা তীরে অপেক্ষা করিবে।"

মাঝি অমলেন্দুর অভিপ্রায় বুঝিল ; তাঁহার কথা অনুসারে কার্য্য হইল। ঝড় আরও একটু প্রবল হইল। মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, "নৌকা নঙ্গর করিতেছে না কেন ?"

"বুঝা যাইতেছে না ; এ ডাকাতেরই নৌকা, নতুবা এত দুঃসাহস হইত না।"

সহসা নৌকার আলোক নিবিল ; অমলেন্দু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলোক নিবিয়া গেল কি ?" কেহ উত্তর দিল না। আলোক জ্বলিল না দেখিয়া অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বুঝিতেছ ? আবার ছিপ খোল।"

মাঝি এবার জানাইল যে ভীষণ ঝড় উঠিতেছে, ছিপ খোলা সঙ্গত হইবে না। এমন সময় নৌকায় একবার আলোক জ্বলিয়া উঠিল, আবার নিবিয়া গেল। ভয়ানক ঝড় উঠিল। অমলেন্দু বলিলেন, "খোল ; বিলম্ব করিও না।" মাঝি আবার ঝড়ের কথা বলিল। অমলেন্দু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমার না আসা উচিত ছিল ; সব পণ্ড করিবে কি ?" মাঝি অগত্যা ছিপ খুলিল। বায়ুর তাড়নায় ছিপ দুলিতে লাগিল। দুইজন লোক রশি ধরিয়া ছিপ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যুতের আলোকে অমলেন্দু দেখিলেন, নৌকা তীরে লাগিয়াছে। ঝড় ভীষণতর হইয়া উঠিল ; মাঝি আরও দুইজনকে গুণ ধরিবার জন্য নামাইয়া দিল ; পবনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুইজনে ছিপ সামলাইতে অসমর্থ হইয়াছিল।

অমলেন্দু ছিপের ছাদে বসিয়া ভিজিতেছিলেন, মাঝিকে নৌকার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া তিনি ভিতরে যাইতেছিলেন, এমন সময় একটা প্রবল বাত্যা আসিল ; নৌকার নঙ্গর গঙ্গাতীরে বালির উপর রাখা হইয়াছিল, বালি সরিয়া গেল, নৌকা নঙ্গর টানিয়া বাহির জলে ভাসিয়া গেল। মাঝি সাবধান হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় বেগে ঝড় আসিল, সেই ঝড়েই নৌকা ডুবিল।

"দয়ারাম, নৌকা যে ডুবিল" বলিয়াই

অমলেন্দু গঙ্গার জলে পড়িলেন, গয়ারামও ঝাঁপ দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতা।

তখনও ঝড় বৃষ্টি থামে নাই। অন্ধকারে অমলেন্দু জলমগ্ন জনগণের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। একবার গা ভাসান দিয়া কান পাতিয়া রহিলেন, যদি কাহারও সন্তরণ জনিত শব্দ শুনিতে পান, কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলেন না—কেবল মেঘগর্জ্জন ও পবনের শন্ শন্ শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এইভাবে কিছুক্ষণ সন্তরণ ও জলমগ্ন জনগণের সন্ধান করিবার পর হতাশ হইয়া অমলেন্দু গয়ারামকে ডাকিলেন। দুই তিন বার আহ্বানের পর গয়ারাম দূর হইতে উত্তর দিল। অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহারও সন্ধান পাইলে?" গয়ারাম উত্তর দিল "না"। অমলেন্দু তাহাকে তীরে উঠিতে বলিলেন। উভয়ে তীরে উঠিলেন।

তীরে উঠিলে উভয়েরই কম্প বোধ হইল। গয়ারাম বলিল "ছিপে গিয়া বস্ত্র ত্যাগ করিবেন চলুন।" অমলেন্দু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দূরে কে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে মহাশয়?"

অমলেন্দু উত্তর দিলেন, "আমরা যাত্রী, হয় ত আমরা আপনারই সন্ধান করিতেছি।"

প্রশ্নকর্ত্তা নিকটে আসিলেন, বিদ্যুৎ চমকিল। তিনি উভয়কে তিলেকের আলোকে দেখিয়া বুঝিলেন যে এক জন ভদ্র লোক, অপর ব্যক্তি সম্ভবতঃ তাঁহার ভৃত্য। অমলেন্দু দেখিলেন যে প্রশ্নকর্ত্তাও একজন ভদ্রলোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নৌকাই কি ডুবিয়াছে?"

"হাঁ, আমরা বিপন্ন হইয়াছি।"

"আমরা? আপনার সহিত আর কে কে আছেন?"

"আমার এক কন্যা আছেন। আমরা শান্তিপুর হইতে আসিতেছিলাম, পথে বিপন্ন হইয়াছি।"

"চিন্তিত হইবেন না; আপনার কন্যা কোথায়?

"ভগবানের কৃপায় তাহাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি। আপনারা কে মহাশয়?"

"আমরাও যাত্রী; ঝড়ের জন্য ছিপ তীরে লাগাইয়াছিলাম, আপনাদের নৌকা নোঙ্গর ছিঁড়িল ও ডুবিল দেখিয়াই আমরা আপনাদিগের উদ্ধারের জন্য জলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম।"

"ভগবান আপনাদিগের মঙ্গল করুন—এখন আপনারা কোথায় যাইবেন?"

অমলেন্দু আগন্তুকের কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনে সন্দেহও হইল। তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "আমরা কাটোয়া হইতে আসিয়াছি, কলিকাতায় যাইব।" গয়ারামকে বলিলেন, "দেখ একটা আলোক লইয়া আইস।" গয়ারাম প্রভুর কথা বুঝিল। আগন্তুক আলোক আনিতে নিষেধ করিলেও সে চলিয়া গেল। অমলেন্দু বলিলেন, "এই দুর্য্যোগে কন্যাকে কোথায়

আমার ছিপে বিশ্রাম করিবেন কি?"

আগন্তুক কি ভাবিলেন; শেষে বলিলেন, "আপনি আমাদের প্রাণরক্ষার জন্ম নিজের বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, আপনার কথা ঠেলিতে পারিব না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন; আমার কন্যা নিতান্ত বালিকা, তাহাকে লইয়া আসি; আহা, তাহার বড় কষ্ট হইয়াছে।"

অমলেন্দুর মনে হইল, আগন্তুক যেন কথাগুলি সাজাইয়া বলিতেছেন। যাহা হউক তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিছুদূর যাইয়া আগন্তুক ডাকিলেন, "কোথায় মা?" বালিকা উত্তর দিল, "এসেছেন, এই যে আমি।"

আগন্তুক বালিকাকে তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিতে বলিলেন এবং অমলেন্দুর কথা তাহার নিকটে প্রকাশ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় চারি জন লোক তাঁহাদিগের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। তখন ঝড় ও জল অনেকটা থামিয়া গিয়াছে।

অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে?"

চারিজনের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কে?" আগন্তুক কন্যাকে আপনার নিকটে টানিয়া লইলেন।

অমলেন্দু বলিলেন, "আমরা যাত্রী, অদূরে আমার নৌকা বাঁধা আছে; আর আমার সঙ্গী দুইজনের নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, আমি ইঁহাদিগের সন্ধান করিবার জন্য নৌকা হইতে আসিয়াছিলাম।"

পথরোধকারী বলিল, "তোমার নৌকা আমরা দেখিয়াছি। ইহারা তোমার কে?"

"আমি কোন কথার উত্তর দিব না, তোমরা কে আগে তাহা বল।"

"আমরা পুলিশ—তোমার সঙ্গে কে কে আছে?"

"পুলিশ! এখানে ত লোকালয় নাই; এ দুর্য্যোগে এখানে পুলিশ কেন?"

"ডাকাত গ্রেপ্তার করিতে। ওরা কে?"

"পিতা পুত্রী—আমার পরিচিত নহেন; তবে দস্যুও নহেন।"

"স্ত্রীলোক আছেন? যাই হউক, আমরা গ্রেপ্তার করিব।"

"আমরা ত দস্যু নহি, কেন গ্রেপ্তার করিবে?"

প্রশ্নকারী ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোক তিন জনের মুখের উপর ধরিল; শেষে বলিল, আচ্ছা, চলিয়া যাও।" তাহারাও চলিয়া গেল।

এতক্ষণ আগন্তুক কোন কথা কহেন নাই; এখন তিনি বলিলেন. "আপনি আবার এক দায় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন; কিন্তু আর আমরা আপনার নৌকায় যাইব না; আমাদের জন্য আপনার অনিষ্ট হইতে পারে; এখনই ত আপনাকেও গ্রেপ্তার করিত।"

"ভদ্রলোকের বিপদে যদি ভদ্রলোক সাহায্য না করিবে, তবে কে করিবে? এতক্ষণ আর্দ্র বস্ত্রে আছেন, আর থাকিবেন না, আপনাদের পীড়া হইবে, বিশেষ আপনার কন্যা নিতান্ত বালিকা।"

আগন্তুক কাজেই নৌকায় যাইতে স্বীকার

করিলেন। পুলিশের লোকেরা ক্ষিপ্রতার সহিত ষ্টিমে আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। অমলেন্দু আগন্তুক ও তাঁহার কন্যাকে ষ্টিমে তুলিয়া দিয়া আপনি উঠিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে গয়ারাম ধৌত বস্ত্র বাহির করিয়া দিল। সকলে বস্ত্র ত্যাগ করিলেন। অতঃপর আহারের উদ্‌যোগ হইল। আহারান্তে আগন্তুক জানাইলেন যে তাঁহারা চুঁচুড়ায় যাইতে পারেন। অমলেন্দু তাঁহাদিগকে চুঁচুড়ায় পৌঁছাইয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

ষ্টিমে আসিয়া অমলেন্দু দেখিলেন যে আগন্তুকের কন্যা বালিকা সত্য, কিন্তু বালিকার হাবভাব তাহার নাই। অমলেন্দুর বোধ হইল যে বালিকা অতিরিক্ত চতুরা, যেন তেজে ফাটিয়া পড়িতেছে। বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে, কিন্তু বিবাহ হয় নাই।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে অমলেন্দু ষ্টিম খুলিবার আদেশ দিলেন। ভাটার মুখে ষ্টিম্ দ্রুত চলিল। অমলেন্দু পরিচিত ব্যক্তিকে বলিলেন, "আপনার সাহচর্য্যে বড় প্রীত হইলাম, কিন্তু এপর্য্যন্ত আপনার পরিচয় না লওয়ায় বোধ হয় বড় অপরাধ করিয়াছি।"

যেরূপ বিপদ মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, তাহাতে, আমারও এ বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে। চুঁচুড়ায় আমার এক আত্মীয় আছেন, কোন কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহারই নিকটে যাইতেছি।

"চুঁচুড়ায় আমি কিছুদিন ছিলাম, কে আপনার আত্মীয়?"

"হরিপ্রসন্ন রায়—ব্যবসার উপলক্ষে তিনি চুঁচুড়ায় থাকেন, বোধ হয় আপনি তাঁহাকে চিনিবেন না।"

"না, চিনিতে পারিলাম না।"

"মহাশয়ের পরিচয়টা জানিতে পারিব কি?"

"আমার নাম কৈলাস চন্দ্র বসু; কুশপুরে আমার বাড়ী, সেখানে কিছু জমিজমা আছে; তাহার উপর কলিকাতায় ব্যবসায়ও আছে।"

"আপনি যে মহাশয় লোক, আপনার ব্যবহার দেখিয়াই তাহা বুঝিয়াছিলাম। আপনি আমার কন্যার জীবন দান করিলেন; আপনার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।"

অতঃপর আরও দুই একটা কথা হইলে অমলেন্দু তাঁহাকে শয়ন করিতে বলিয়া নিজে ষ্টিমের বাহিরে আসিলেন। জগদানন্দ সিংহ ইহাতে আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন যে ষ্টিমের বাহিরে শয়ন করায় তিনি অভ্যস্ত, ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত কথা এই যে, অমলেন্দু অধিকক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না।

রাত্রিশেষে সুযোগ বুঝিয়া অমলেন্দু গয়ারামকে বলিলেন, "দেখ, আমার সন্দেহ হইতেছে, চুঁচুড়ায় ব্যবসায়ী হরিপ্রসন্ন রায় কে? যাহাই হউক, তোমাকে একটা কার্য্য করিতে হইবে।" অমলেন্দু গয়ারামকে কিছু উপদেশ দিলেন।

যথাসময়ে ষ্টিম চুঁচুড়ার অদূরে ঘাটে

গিয়া লাগিল। একজন সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল, "কাহার ছিপ ?"

গয়ারাম উত্তর দিল, "সওদাগরী।" সিপাহী ফিরিয়া যাইতেছিল, গয়ারাম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাজার কতদূরে ?" সিপাহী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, "কাছেই।" অমলেন্দু তখনও ছিপের ছাদে ছিলেন, জগদানন্দ ও তাঁহার কন্যা ভিতরেই ছিলেন। গয়ারাম নামিয়া গেল।

জগদানন্দ কন্যাকে লইয়া অমলেন্দুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন। বলিলেন "আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

"বেশ! এমন কথা বলিতেছেন কেন ?"

জগদানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "তবে আসি" —বালিকা নমস্কার করিল। অমলেন্দু এখনও দেখিলেন, বালিকার সেই ভাব। উভয়ে ছিপ হইতে তীরে নামিলেন। অমলেন্দু ছিপের ভিতরে গেলেন। তাঁহার মনে আবার সন্দেহ হইল; চুঁচুড়ায় আত্মীয়ের বাড়ী, আমি কলিকাতায় যাইব শুনিলেন, অথচ একবারও আমাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন না ? অমলেন্দু চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ছিপ হইতে নামিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইবার পরই একজন পুলিশ কর্ম্মচারী জগদানন্দকে আটক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি ?"

"জগদানন্দ সিংহ; কেন মহাশয় ?"

"প্রয়োজন আছে; আপনার নাম জগদানন্দ নহে, কালাচাঁদ সিংহ, নহে কি ?"

"জগদানন্দ হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "কালাচাঁদ সিংহ কে ?"

"আপনি—আমি আপনাকে চিনি। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।"

জগদানন্দ যেন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "বেশ, আমাকে যদি কালাচাঁদ বলিয়াই মনে করেন, তবে আমার অপরাধটা কি, তাহা শুনিতে পাইব না কি ?"

"অপরাধ, দস্যুতা।"

"আমি দস্যু ?" জগদানন্দ আবার হাসিয়া উঠিলেন। শেষে কন্যার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল মা, এক পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছি দেখিতেছি।"

"পাগল হইলেও আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।"

এইবার উভয়ের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। অমলেন্দু গোলমাল শুনিয়া ছিপের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জগদানন্দ বাবু ? গোলযোগ কিসের ?"

জগদানন্দ ক্রোধভরে বলিলেন, "পুলিশের কাজ পাইয়া লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; বলে আমি কালাচাঁদ! দেখুন ত মশায়!"

অমলেন্দু ধীরে ধীরে তীরে আসিলেন; দেখিলেন বালিকা ছল ছল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। অমলেন্দু পুলিশ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভদ্রলোককে আটক করিতেছেন কেন ?

"ইনি দস্যু; গ্রেপ্তারের হুকুম আছে।"

অমলেন্দুও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,

'বলিলেন, দস্যু কি এই রকম? উনি যে আমার সঙ্গে আসিলেন তবে আমাকেও দস্যু বলিয়া গ্রেপ্তার করিবেন না কেন?"

"ইহাকে চিনি, তাই আটক করিয়াছি, আপনাকে চিনিলে আপনাকেও আটক করিতাম।"

"বলি, দস্যুর সঙ্গে কি সৎলোক থাকে? আমিও ত দস্যু হইতে পারি?"

"বেশ, না হয় গ্রেপ্তার করিব না; একবার থানায় যাইতে দোষ কি?"

জগদানন্দ বাবু কথাটা শুনিয়াই বলিলেন, "হাঁ, কেন যাইব না? চল; কোথায় যাইতে চল।" অমলেন্দু বলিলেন, "ভয় কি ইহার মহাশয়, চলুন আমিও যাইতেছি।"

সকলে থানায় গেলেন। পুলিশ জগদানন্দকে ও তাঁহার কন্যাকে একটি ঘরে বসাইয়া রাখিল। অমলেন্দু বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; একজন প্রহরী তাঁহাকে লইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অমলেন্দু রাগে গজ্ গজ্ করিতে করিতে প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীকে লইয়া জগদানন্দ বাবুর নিকটে গমন করিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারী একখানি কাগজ দেখিলেন, কয়েকবার জগদানন্দ সিংহের মুখ নিরীক্ষণ করিলেন, শেষে বলিলেন, "ভুল হইয়াছে, আপনি যাইতে পারেন।"

জগদানন্দ ও তাঁহার কন্যা উঠিলেন। জগদানন্দ বলিলেন, "পুলিশ কেবল নাকাল করিতেই পারে।" পুলিশ কর্ম্মচারী অমলেন্দুর গা টিপিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "কাজটা ভাল করিলেন না।"

থানা হইতে বাহির হইবার পর জগদানন্দের কন্যা অমলেন্দুকে বলিলেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে আসিবেন? আমাদের বাড়ী বেশী দূরে নহে।" অমলেন্দু এইবার জগদানন্দের কন্যার বালিকাসুলভ হাবভাব দেখিলেন। তিনি বলিলেন, "থাক, আমাকে কলিকাতার যাইতেই হইবে; ফিরিবার সময়ে অবশ্যই দেখা করিয়া যাইব। জগদানন্দের কন্যা রাজপথে আবার ভূমিষ্ঠা হইয়া অমলেন্দুকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ নমস্কার করিল। সকলে পৃথক দিকে চলিয়া গেলেন। ক্রমশঃ

ভৌতিক বিবাহ।

—:o:—

"রমেশ! রমেশ!! বাড়ীতে আছ?" বৈশাখের দারুণ মধ্যাহ্ন-কালে একটী সুসজ্জিত যুবক শ্রীধরপুরের বোসেদের বাটীর দরজায় আসিয়া করাঘাত করিল। বহির্ব্বাটীর দরজা খুলিয়া একটী যুবক বাহিরে আসিয়াই বলিল—কেও নগেন? কোথা হইতে? এস, এস, ভিতরে এস—বলিয়া আগন্তুক যুবককে ভিতরে লইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া যে যুবক আগন্তুককে ডাকিল—সে বোসেদের মেজবাবু জ্যেষ্ঠ পুত্র-রমেশ! নগেন তাহার সহপাঠী, গ্রামান্তরে বাস। নগেনকে হঠাৎ এরূপ ভাবে আসিতে দেখিয়া রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—নগেন! কেন হ্যা-এমন সময় এলে যে?" "ভাই! অগ্রে একটু জল দাও বড়ই পিপাসা পাইয়াছে। রমেশ জল আনিতে গেল। নগেন রমেশের বাল্যকালের সঙ্গী—পিতৃ মাতৃ হীন, একপ্রকা

পিতৃস্বসা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। পিসির অবস্থাও তাদৃশ ভাল নহে। অন্য সময়ে নগেন অবস্থানুসারেই চলে, আজ একি পরিবর্ত্তন। বেশ ভূষার পারিপাট্য দেখিয়া রমেশ কোন কথা না কহিয়া অগ্রে জল আনিতে গেল। রমেশ কিয়ৎক্ষণ পরে একটী পাত্রে সুবাসিত বারি আনিয়া নগেনের হাতে দিল। পিপাসায় ওষ্ঠাগত-প্রাণ নগেন জলপানে পিপাসার শান্তি করিয়া বলিল—রমেশ! তুমি আমার বেশ-ভূষার পারিপাট্য দেখিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইয়াছ, আমি ইহা চুরি ডাকাতি করিয়া আনি নাই—ইহার ভিতর অনেক কথা আছে স্থির হইয়া বসো, বলিতেছি।

রমেশ অবহিতচিত্তে শুনিতে লাগিল। নগেন বলিতে লাগিল :—ভাই! বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, কাল সন্ধ্যার সময়ে আমাদের বাটীর পশ্চাতে পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতেছি—নিকটে জন-মানব নাই। এমন সময় সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন অতি মৃদুস্বরে বলিল—"বাবা নগেন!" আমি তখন অন্যমনস্ক ছিলাম, চমকিত হইয়া দেখিলাম, পশ্চাতে এক বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি অতি সুন্দর বয়সের আধিক্যহেতু তাঁহার শরীর-কান্তির কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য হয় নাই; এখনও যেন তাঁহার মুখমণ্ডলে যৌবনের পূর্ণ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতেছে, দেহ-যষ্টি সরল ও ঋজু, ললাট উন্নত, চক্ষে প্রতিভার আলোকচ্ছটা দেদীপ্যমান। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিনীতভাবে বলিলাম—আজ্ঞে, কি বলিতেছেন মহাশয়? বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—তোমার স্বর্গীয় পিতা মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ছিল। সেই সুন্দর মুখ, সেই সস্নেহ মৃদু হাস্য জ্যোতির্জ্জ্বল উন্নত ললাট আজও যেন আমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে। বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষে অশ্রু সঞ্চার হইল। বৃদ্ধ গদগদ কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—মহেন্দ্র আমার প্রাণের বন্ধু তিনি যে দিন প্রাণত্যাগ করিলেন সেই দিন হইতে আমার জন্মভূমি আমার চক্ষে মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই মহেন্দ্রর মূর্ত্তি আমার নেত্রপথে প্রতিভাত হইতে লাগিল। আমি সকল বিষয়ের সঙ্গেই মহেন্দ্রর স্মৃতি বিজড়িত দেখিতে লাগিলাম। দেশে বাস করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। আমার পরিবার ও শিশু-কন্যা মনোরমাকে লইয়া কাশীবাসী হইলাম। মহেন্দ্রের জীবিতাবস্থায় তোমার সহিত মনোরমার বিবাহ দিব বলিয়া কত আনন্দ করিতাম হায় সে দিন!—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইলে। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—তখনকার হাস্য পরিহাস এখন আমার নিকট কঠিন প্রতিজ্ঞা বলিয়া মনে হইতেছে; তাই আজ পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া পুনরায় শ্রীধরপুরে আসিয়াছি। মনোরমাকে তোমায় গ্রহণ করিতে হইবে—এই বলিয়া বৃদ্ধ আমার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলেন।

আমি এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলাম। রীতিমত লেখা পড়া শিখিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে বিবাহ করিব না—আমার এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় তুমি অবগত আছ। কিন্তু বৃদ্ধের আগ্রহাতিশয্যে আমি বাধা দিয়া

বলিলাম—করেন কি মশায়! আপনি আমার পিতৃবন্ধু, আমার পূজনীয়—আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন—আমি তাহা পালন করিতে বাধ্য। এবার বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হইল, তিনি বলিলেন—চল বাবা। তোমার পিসির সঙ্গে দেখা করিয়া একটা কথা স্থির করিয়া আসি; বিবাহের আর বেশী দিন নাই।

বৃদ্ধকে সঙ্গে করিয়া আমি বাটী চলিলাম। বৃদ্ধ বাটীর নিকটে গিয়াই আমার পিসিমার নাম ধরিয়া "ভবানী","ভবানী" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। পিসিমা আসিয়াই অবাক হইয়া গেলেন—খানিক পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—আমি তোমাদের দুঃসংবাদ শুনে বড়ই মনঃকষ্টে ছিলাম—যাহা হউক এখন সে সমস্ত মিথ্যা গুজব দেখছি! তবে কবে এখানে এলে দাদা? বৃদ্ধ বলিলেন—আজ তিন দিন। ক্রমে বৃদ্ধ আমার বিবাহের কথা পাড়িলেন, পিসিমাও আনন্দে সম্মতি দিলেন। এই বৃদ্ধ এই গ্রামের জমিদার ছিলেন—নানাপ্রকার মনঃকষ্টে জমিদারী বিক্রয় করিয়া তীর্থবাসী হইয়াছিলেন—আজ কয়েক দিবস হইল গ্রামে তাঁহাদের সপরিবারের মৃত্যু সংবাদ রটিয়াছিল। ভবানীশঙ্কর রায় শ্রীধরপুরের জমিদার ছিলেন—তাঁহার বিষয় সম্পত্তি, নগদ টাকা যথেষ্ট আছে; এরূপ ধনবান লোকের কন্যার সহিত বিবাহ হইলে কোন্ স্ত্রীলোক আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে। সে যাহা হউক আমার কেবল মনোরমা সম্বন্ধে একটু আপত্তি রহিল, মনোরমা দেখিতে কেমন! সুন্দরী ত? এইটি হইলেই একেবারে মণি-কাঞ্চন সংযোগ হয়।

বৃদ্ধ যেন আমার অন্তঃকরণ বুঝিতে পারিলেন—তিনি বলিলেন—বাবা নগেন! মনোরমাকে একবার তোমার দেখা উচিত, তোমার অমতে ত বিবাহ হইতে পারে না। আমি লজ্জায় অধোবদন হইলাম। পরদিন পাত্রী দেখিবার দিন স্থির হইল।

ইতোমধ্যেই কিন্তু পিসিমার নিকট বিবাহের দিন স্থির হইল ৮ই বৈশাখ আমাদের বিবাহ হইবে।

পিসিমা বলিলেন—দাদা! নগেনের আর কে আছে? এসব উদ্যোগ পত্র করিবে কে? বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন—তার জন্য আর চিন্তা কি দিদি। আমিই সমস্ত করিয়া দিব। মহেন্দ্রের ছেলে ত আর পর নয়—এই বলিয়া বৃদ্ধ সেদিনকার মত চলিয়া গেলেন।

পরদিন আমি পাত্রী দেখিয়া আসিলাম। পাত্রী দেখিয়া আমার কোন আপত্তি রহিল না। আমি তেমন সুন্দরী আর কখনও দেখি নাই। এ কয়দিন নানা প্রকার উদ্যোগাদিতে কাটিয়া গিয়াছে—তোমার সঙ্গে দেখা করিতেও পারি নাই। আজ সন্ধ্যার সময় বিবাহ; তোমাকে কিন্তু যাইতেই হইবে।

নারীর চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য পরিবর্ত্তন ইহা বিধাতার অগোচর! নগেনের ভাগ্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া রমেশ বড়ই আনন্দিত হইল। বিবাহের কথা লইয়া কিয়ৎক্ষণ হাস্য-পরিহাসের পর নগেন চলিয়া গেল। রমেশও বরযাত্রী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

বৈশাখের ভীষণ রৌদ্র মন্দ-তাব ধারণ

করিল। অপরাহ্ন সময়ে রমেশ সুসজ্জিত হইয়া নগেনের বাটি উপস্থিত হইল।

বিবাহের খুব ধুম। নানা প্রকার বাদ্য-যন্ত্রের সুমধুর নিনাদে সান্ধ্য আকাশ নিনাদিত হইতে লাগিল। জমিদার মহাশয়ের ইচ্ছায় নগেনের ন্যায় দরিদ্রের বিবাহে এরূপ জাঁক-জমক হওয়া অসম্ভব নহে।

বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বরসহ বরযাত্রিগণ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জমিদারের জীর্ণ বাটী, যাহা এতদিন ভূতের বাড়ী বলিয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিত, আজ দুই তিন দিনের চেষ্টায় সে বাটী এরূপ নয়ন-মনোহর স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইল। যাহা অসম্ভব তাহাই আজ সম্ভব হইয়াছে।

যথাসময়ে ভবানী বাবু আসিয়া সকলের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। গোধূলী লগ্নেই বিবাহ, পাত্রকে বিবাহ স্থলে লইয়া যাওয়া হইল। নগেনের মুখে আনন্দের লহরী-লীলা দেখিয়া সকলেই সুখী হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বরযাত্রিগণ বিবাহ স্থলে উপস্থিত হইয়া কন্যা দর্শন করিলেন। বাস্তবিক এমন সুন্দরী কন্যা জীবনে কেহ কখন দেখে নাই। নগেনের অদৃষ্ট যে সুপ্রসন্ন, তাহা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন।

বিবাহের পর আহারের পালা। কি অপূর্ব্ব আয়োজন; নানা প্রকার উপাদেয় আহারীয় সামগ্রীর একত্র সমাবেশ; ভোজ্য দ্রব্যের সংখ্যা ও গুণের উৎকর্ষে সকলেই মুগ্ধ হইল।

এই স্থানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিবেশকের সংখ্যা মোটে ২৩ জন, কিন্তু কোথাও কোন বস্তুর অপ্রতুল হইতেছে না; যেন কোন এক অপূর্ব্ব মায়াবলে সমস্ত সম্পাদিত হইল। সকলেই ভোজনে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিল। এমন জাঁকালো বিবাহে কিন্তু একটা বিশেষ অলহানি দেখিলাম—প্রতিবাসী কোন ব্যক্তি এ বিবাহে উপস্থিত নাই, বিবাহে বাসরঘর মোটে জমিল না। কারণ, স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল ভবানী বাবুর স্ত্রী, কাজেই নগেন বাহিরে আসিয়া রমেশের কাছে শয়ন করিল। নানা রহস্যানন্দে রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন বর কন্যা লইয়া সকলে বাটী আসিলেন, কন্যা দেখিয়া সকলেই সুখী হইল। বরযাত্রিগণ স্ব স্ব আবাসে গমন করিল, রমেশও বাটী গমন করিল। নগেনের বিবাহে রমেশের কিন্তু একটা সন্দেহ জন্মিল। এরূপ বিবাহে, আত্মীয় স্বজন নাই, স্ত্রী-আচার নাই। ইহা কি তবে নূতন পদ্ধতি?

সেই দিন রাত্রি ১২ টার সময় নগেনের ফুলশয্যা। বরকন্যাকে নানাবিধ উপহার দিতে আসিয়া রমেশ বন্ধুর সৌভাগ্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শয্যায় শয়ন করিল। ঠিক নিদ্রা হইল না, স্বপ্নে নানাবিধ সুখচিত্র দেখিয়া রমেশ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে এমন সময় হঠাৎ বিকট কণ্ঠে ভীষণ চিৎকার শুনিয়া জাগিয়া উঠিল—

রমেশ! রমেশ!

একি নগেনের কণ্ঠস্বর না? এ সুখের সময়, এত রাত্রে নগেন এরূপ ভাবে ডাকিতেছে কেন? কোন অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় রমেশের

হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া রমেশ বাহিরে আসিয়া দেখিল,—এক-মাত্র বস্ত্র পরিহিত, কণ্টক-ছিন্ন-পদ-যুগল, নগেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে।

"একি নগেন যে!" বলিবামাত্র নগেন সশব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। রমেশ তাড়াতাড়ি নগেনকে তুলিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল; অনেক সেবাশুশ্রূষার পর তাহার কথঞ্চিৎ চৈতন্য সম্পাদিত হইলে—নগেন চিৎ-কার করিয়া বলিয়া উঠিল—ভূত। ভূত।

রমেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিমূঢ়ের ন্যায় কেবল তাহার সেবা করিতে লাগিল। এরূপে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে নগে-নের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। সে উঠিয়া বসিলে— রমেশ তাহার মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

নগেন সভয়ে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল ভাই! একটা আশ্চর্য্য আমি বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। একবারও আমার স্ত্রী আমাকে স্পর্শ করে নাই; অদ্য রাত্রে এক সঙ্গে শয়ন করিতে গিয়া আমার স্ত্রীকে নিকটে ডাকিলাম। সে একটু দূরে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আমি কিছু বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য উঠিয়া গেলাম, সেও ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিল। ধরি ধরি এমন সময় এক বিকট হাস্য করিয়া সে শূন্যে মিলা-ইয়া গেল। ভাই! এ কি সর্ব্বনাশ!

নগেনের কথা শুনিয়া রমেশের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল, সে ভাবিল—একি ব্যাপার। তবে কি পূর্ব্বের মৃত্যু সংবাদ সকলই সত্য। আতঙ্ক ও উদ্বেগে সে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিন নগেন সুন্দরী বধূকে অনেক অনু-সন্ধান করিয়াও পাইল না। গ্রামে এই অলৌ-কিক বার্ত্তা শীঘ্রই প্রচারিত হইল।

কয়েক জন সাহসী লোক মিলিত হইয়া ভবানী বাবুর বিবাহ বাটী দেখিতে গেলেন, কোথায় সে শোভা, কোথায় সে সৌন্দর্য্য; সেই ভগ্ন জীর্ণ শীর্ণ-নির্জ্জন প্রাসাদ! যেন প্রতি মূহূর্ত্তে জীব জীবনে কি এক অব্যক্ত ভীতি প্রদান করিতেছে। প্রত্যেক প্রাচীর গাত্রে নিবিষ্টচিত্তে চাহিলে যেন আশ্চর্য্যকাণ্ড সকল দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই সকল ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়া সকলেই সভয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

তিন চারি দিন পরে সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল যে, যে দিন নগেনের সহিত বৃদ্ধ ভবানী বাবুর সাক্ষাৎ হয়, ঠিক তাহার তিনি দিন পূর্ব্বে ভবানী বাবু সপরিবারে কলেরায় মারা গিয়া-ছেন। শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও স্ত্রীর সহিত নগেনের কয়েকবার দেখা হইয়াছিল। কখন ভূতের ভালবাসায়, কখন ভূতের তাড়নায় নগেনকে অস্থির হইতে হইয়াছিল; মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা নগেনের দেহযষ্টিকে জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া ফেলিল। রমেশের পরামর্শে একদিন নগেন বহু কষ্টে গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া সে বিবাহ দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। ইহার পর নগেন আর বিবাহ করে নাই। সেই ঘটনা হইতে বিবাহের নামে সে কেমন ভীতি-বিহ্বল হইত। গ্রামবাসীর বহু অনুরোধেও নগেন গৃহবাসে বিরত হইয়া শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জীবনের সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল।

সম্পাদক।



শ্রীযুক্ত সারদা চরণ চট্টোপাধ্যায়।

BEJOY PRESS.

শ্যামা সঙ্গীত।

—:•:—

আমার মায়ের রূপে জগত আলো।
কে বলে শ্যামা মা আমার কালো ?
লতা পাতা ফুল ফল,
রবি শশী জল স্থল,
উদ্ভাসিত ভূমণ্ডল ;
যে দেকে ফিরিয়ে চাই,
(মার) রূপ বিনে যে কিছু নাই ;
রবি মায়ের রূপে ভাসে, মায়ের রূপে
সব উজল ॥

নিজ রূপে রচি ফুল,
হইয়া মধুপ কুল,
নিজে ফুল মধু খায়,
নিজ রূপ নিজে চায়,
তাজ্জব মায়ের খেলা,
দেখে হই আপন ভুলা ;
দে'খে যোগী ঋষি সব পাগল ॥

গাভি সেজে (মা) আগে যায়,
বৎস হ'য়ে পাছে ধায় ;
পুনঃ পুনঃ [illegible] চায় ;
[illegible] মায় ;
নিজে মা রাখাল হয়ে,
পাচি বৎস ধায় নিয়ে ;
এমনি মায়ের খেলা দেখে মন হয় পাগল ॥
কখন মা শ্যাম সাজে,
বনমালা গলে রাজে,
মধুর বাঁশরী রবে নাচায় যমুনা জল ॥
নিজে মা নব বধূ হয়,
মুখ ঢাকা ঘোমটায় ;
শাশুড়ি সাজিয়া পুনঃ
শিখান গৃহিণী-পন ;
কখন মা প্রসূতি হয়,
নিজে তার হয় তনয় ;—
আধ আধ মা মা বলে,
আনন্দে মোর মা উথলে ;
(দেখে) জগত ভুলিয়ে রয়, (মার) এমনি
খেলার বল ॥
যে দিকে ফিরিয়ে চাই,
(মার) রূপ বিনা যে কিছু নাই ;
সবই মায়ের রূপের খেল, মায়ের রূপে
সব উজল ॥

শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী।

বসন্ত অন্তে।

—•:;—

সুখের বসন্ত সখি গিয়েছে চলিয়া,
আরতো ডাকে না শাখে কোকিল পাপিয়া,
মলয় সোহাগ ভরে,
চুমে না তটিনী নীরে,
কাননে কুসুম বালা গিয়েছে ঝরিয়া,
সমীর পরশে লতা উঠে না কাঁপিয়া।
আমারো সকলি হায়! গিয়েছে ফুরায়ে;
হৃদি মাঝে স্মৃতিটুকু রয়েছে জাগিয়ে।

শৈশবের সুখ চয়,
আজি সব মনে হয়,
মনে হয় জননীর স্নেহমাখা ক্রোড়,
পাইব না এ জনমে সুখনিশি ভোর।
বাল্য সহচর সনে কত না আমোদে,
খেলিয়াছি কত খেলা আজো জাগে হৃদে।

বসি দোঁহে তরুতলে,
গাঁথিয়াছি কুতুহলে,
বনজ কুসুম তুলে সোহাগের হার;
হায়রে সেদিন ফিরে আসিবে না আর।
সংসারের কোলাহল পশে নাই কাণে
শান্তিতে ছিলাম সদা শান্তিময় প্রাণে।

এবে ভীত হৃদি মোর,
হেরিয়ে সংসার ঘোর,
সংসার সাগরে ঊর্ম্মি এতই ভীষণ
ভাবি নাই, জানি নাই বারেক তখন।
ছিল না আশার মোহ সুখের কামনা
স্বার্থের লাগিয়া প্রাণে ছিল না বাসনা।
পাপের কণ্টক ফুল,
কভু না জন্মাত ভুল,
এবে কোথা সেইদিন সে শুভ সময়;
চলে গেছে, ফুরায়েছে হবে না উদয়।

শ্রীকুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

দস্যুদলন বা অদ্ভূত গোয়েন্দা

—:•:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্যর্থ চেষ্টা।

ত্রিবেণী—ঘাটের অদূরে তৃণক্ষেত্রের উপরে বসিয়া অজিতকুমার তাঁহার বন্ধু ভূপতিচরণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। গঙ্গার মাঝিরা নৌকার সারিতে সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়াছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্তিহেতু কেহ বা নৌকায় বসিয়া সূতা কাটিতেছে, আর গান গাহিতেছে। সন্ধ্যার সমাগমে যেন সেই ক্লান্তি, সেই অবসাদ গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দিন পরে ভূপতিচরণ আজ অজিতকুমারের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাইগঞ্জের কোলাহলের বাহিরে গঙ্গাতীরে অজিতকুমার তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত। এমন সময় সুকুমার পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু দূরে উপবেশন করিলেন। অজিতকুমার অপরের অলক্ষ্যে তাহা দেখিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের কথোপকথনে ব্যাঘাত ঘটিল না।

কথায় কথায় অজিতকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, দূরে বসিয়া সুকুমার সেই

হাসির অনুকরণ করিলেন। সুকুমারের আচরণে অজিতকুমারের ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিল না, কিন্তু ভূপতিচরণ বড় বিস্মিত হইলেন। তিনি অজিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে হে? পাগল না কি?

"না" বলিয়া অজিতকুমার পূর্ব্বকথার অবতারণা করিলেন। কিন্তু ভূপতিচরণের দৃষ্টি সুকুমারের প্রতি ন্যস্ত হইল। তিনি দেখিলেন, সুকুমার তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া হাসিতেছেন, নানারূপ ভাবভঙ্গী করিতেছেন। অজিতকে বলিলেন, "দেখ, লোকটা আমাদিগকেই দেখিতেছে, আর হাসিতেছে। তুমি ওকে চেন না কি?"

"না"।

"তবে লোকটা এত স্থান থাকিতে আমাদিগের নিকটে আসিল কেন, আর আমাদিগকে দেখিয়া অমন পাগলামি করিতেছে কেন?"

"নিকটে আর কই? অনেক দূরে বসিয়াছে। যাক্, ওদিকে তুমি চোখ ফিরাইতেছ কেন?"

"দেখ, দেখ—লোকটা ত ভারি বদমায়েসি করিতেছে দেখ।"

"তুমিও যে পাগল হইলে দেখিতেছি!"

"না, এ কেমন কথা—এমন বেয়াদপ লোক ত কখন দেখি নাই। লোকটার কিছু উদ্দেশ্য আছে।"

"থাকে থাকে, এখনই প্রকাশ পাইবে।" অজিত হাসিলেন।

"তুমি হাসিতেছ যে? লোকটাকে জান নাকি? তুমিও হাসিলে, আর ও ব্যক্তি হাসিল। সেটা কি তোমারই উপর দেখিতেছি। চল ত আমরা আর একটু দূরে যাই, দেখি ও কি করে।"

"কি আর করিবে? ও ব্যক্তিও যাইবে।"

"ও! বুঝিয়াছি—তবে যে বলিতেছ, ওকে জান না?"

"সত্যই জানি না, কিন্তু একপ্রকার অনুমান করিতেছি।" অজিতকুমার ও ভূপতিচরণ অন্যত্র উঠিয়া গেলেন। সুকুমার আরও একটু দূরে গিয়া বসিলেন। ভূপতিচরণ আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ব্যাপারটা কি আমাকে জানিতে হইতেছে।" উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"তবে এখন আসি।" ভূপতিচরণ অজিতের নিকট হইতে ফিরিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে সুকুমার তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার বাড়ী কোথায়?"

ভূপতিচরণের বড় রাগ হইল, বলিলেন "যমের বাড়ী"।

"তা যাক, আপনার বাড়ীতে আমি যাইতে চাহি না; আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?"

ভূপতিচরণ দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"কি কথা?"

"ঐ লোকটি কে, আমাকে দেখিয়া কেন হাসিতেছিলেন, বলিবেন কি?"

"তিনি কেন হাসিবেন, আপনিই ত হাসিতেছিলেন!"

"আমি নিজের মনে হাস্যতোছলাম। আপনার

তাঁহাকেও হাসিতে দেখিয়াছি। তিনি কেন হাসিতেছিলেন ?"

"আপনার রকম দেখিয়া আমারও হাসি পাইতেছিল।"

"তা আপনি থাকুন ; তিনি কেন হাসিবেন ? তিনি আমার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছিলেন কি ?"

ভূপতিচরণ কৌতুহলী হইয়া বলিলেন, "বলিতেছিলেন, যে আপনি পাগল।"

সুকুমার আর কোন কথা না বলিয়া অজিতকুমারের দিকে অগ্রসর হইল। ভূপতিচরণ বলিলেন "আপনি ওদিকে যাইতেছেন কেন ?"

"আমি পাগল, তিনি আমাকে এত বড় কথা বলেন !" সুকুমার আর কোন কথা না শুনিয়া অজিতকুমারের কাছে গেল। ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "কি ম'শায়, আপনি আমাকে পাগল বলিয়াছেন কেন ?"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি কি নিজের কাণে শুনিয়াছ ?"

"ঐ ভদ্রলোকটি আমাকে বলিলেন। আরও, আপনি আমাকে তুমি বলিবার কে ?"

"উনি যদি বলিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাগল বলিয়াছি।"

"আবার তুমি ?"—এই বলিয়াই সুকুমার অজিতকুমারকে দুই তিনবার মুষ্ট্যাঘাত করিল। ভূপতিচরণ দৌড়িয়া আসিলেন। অজিত হাসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না— কিছু বলিও না। দেখিতেছ না, লোকটা পাগলই বটে।"

"আবার ঐ কথা!" বলিয়াই সুকুমার আবার মুষ্ট্যাঘাত করিল। অজিতকুমার আবার হাসিলেন। ভূপতিচরণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি অবাক হইয়া অজিতকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুকুমার ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তুমি এমন কাপুরুষ জানিলে তোমার গায়ে হাত তুলিতাম না।"

অজিতকুমার হাসিয়া বলিলেন,—"আমি পুরুষ, তাই রাগ করিলাম না। যাহা হউক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" সুকুমার চলিয়া গেল। ভূপতিচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, তুমি আমাকে অবাক করিয়াছ। কথাটা কি বল ত!"

"লোকটা বিবাদের চেষ্টায় ফিরিতেছিল। আমাকে বেশ দুই এক ঘা দেবে, অথবা হত্যা করিবে, এই ইচ্ছা।" ভূপতিচরণ আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"বল কি ?" অজিতকুমার বলিলেন,—"অনেক কথা, পরে জানাইব।"

—:০:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

সন্দেহ।

অজিতকুমার রাগ করিলেন না, কাজেই বিবাদ পাকিয়া উঠিল না, সুকুমারেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কোনরূপে বিবাদের সৃষ্টি করা এবং আপনাকে অজিতকুমারের শত্রু বলিয়া পরিচয় দেওয়াই সুকুমারের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু চতুর অজিতকুমারের নিকটে সুকুমারের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। তথাপি সুকুমার ভাবিল যে, অজিতকুমারও বুঝিয়াছেন,

যে, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। সুকুমার এই আশায় গঙ্গাতীরপথ ধরিয়া প্রেতবনের দিকে অগ্রসর হইল—উদ্দেশ্য, একবার স্নেহলতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

প্রেতবনের সমীপবর্ত্তী হইয়া সুকুমার গঙ্গা-তীরে উপবেশন করিল। সে প্রেতবনে প্রবেশ করিতেছে, পাছে কেহ ইহা দেখিতে পায়, সেই জন্যই এই অছিলা করিল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—রমণীরত্ন লাভের আশায় নরহত্যা করিতে বসিয়াছি, কালাচাঁদ সর্দ্দারের যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, তাহার নিকট অস্ত্র-শিক্ষা করিয়াছি, দস্যুদিগের সহিত কিছুকাল বেড়াইয়াছি, কিন্তু কখনও এমন মহাপাপ করি নাই। আজ তাহা করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছি। স্নেহলতা কোথায় ছিল, অনেক দিন তাহার কোন সন্ধানই রাখি নাই, তাহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও ছিল না; কিন্তু সেদিন কেন যে দেখা হইল, কেন যে সে প্রেত-বনে লইয়া গেল—কেনই বা সে আমাকে আহার সর্ব্বস্ব দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল, তাহা কে জানে? যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, আমার হাতেই যদি অজিতের মৃত্যু লিখিত থাকে, তবে তাহার প্রতিরোধ করিবার শক্তি আমার নাই।

ভাবিতে ভাবিতে সুকুমার দেখিল যে রাত্রি ক্রমশঃ বাড়িতেছে—চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল; রাত্রিকালে যতটুকু নজর যায়, দেখিল কেহ কোথাও নাই। গঙ্গাতীর হইতে উঠিল; ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

দস্যুগৃহের বহির্দ্বারে আসিয়া সুকুমার দেখিল, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। দ্বারে করাঘাত করিল—একবার, দুইবার, তিনবার করাঘাত করিল, স্নেহলতার কোন সাড়া পাইল না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে অবস্থান করিবার পর আবার একটু জোরে করাঘাত করিল, তথাপি কেহ অর্গল খুলিল না। বাঙ্গপার্শ্ব হইতে এক খণ্ড ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া বাটীর ভিতরে নিক্ষেপ করিল, ইষ্টক সশব্দে দেওয়ালে আহত হইল, তথাপি কেহ অর্গল খুলিল না। সুকুমারের ভাবনা হইল।

আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে সুকুমার দ্বারে আবার করাঘাত করিল। শেষে স্থির করিল যে একবার স্নেহলতাকে ডাকিবে। কিন্তু পাছে তাহার কণ্ঠস্বর বনের সর্ব্বত্র যায়, এই ভয় হইল। সুকুমার ব্যস্ত হইয়া পড়িল; শেষে ডাকিল—কিন্তু স্নেহলতা উত্তর দিল না।

সুকুমার তখন স্নেহলতার বিপদাশঙ্কা করিয়া প্রাচীরের সন্নিহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল; বৃক্ষশাখা হইতে প্রাচীরে অবতরণ করিল, শেষে লাফ দিয়া বাটীর ভিতরে পড়িল। গৃহের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল, চারিদিকে অন্ধকার। একে একে সকল গৃহের দ্বারেই গেল, দেখিল সব দ্বারই খোলা। অন্ধকারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, স্নেহলতা যে গৃহে আছে, তাহা বুঝিতে পারিল না। যে কক্ষে বসিয়া সেদিন স্নেহলতার সহিত সুকুমার কথোপকথন করিয়াছিল, সে কক্ষে সুকুমার হস্তপ্রসারণ করিয়া বুঝিল যে পালঙ্ক আছে, কিন্তু তাহাতে শয্যা নাই—টেবিল আছে, কিন্তু রৌপ্য পাত্রাদি

নাই ; দেওয়ালে হাত দিয়া দেখিল, আয়না গুলিও নাই। দীপের অভাবে সুকুমার প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। স্থির করিল, কাল প্রত্যুষে এখানে আসিয়া রহস্যোদ্ভেদ করিবে।

নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে সুকুমার বহির্দ্বারে আসিল ; অর্গল খুলিবার সময়ে দেখিল যে অর্গলের সহিত একখণ্ড বড় কাগজ আঁটা রহিয়াছে। সুকুমার কাগজখানি লইয়া নিঃশব্দে প্রেতবন হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিজের আবাসে গিয়া সুকুমার কৌতুহল বশতঃ কাগজখানি দীপালোকে ধরিয়া দেখিল। দেখিল যে তাহাতে স্নেহলতা তাহাকেই কয়েকটি কথা লিখিয়াছে। লিখিত বিষয় পাঠ করিয়া সুকুমার বুঝিল যে স্নেহলতা বিশেষ কোন কারণে প্রেতবন হইতে চলিয়া যাইতেছে, দুই একদিনের মধ্যেই ফিরিবে। পত্রে স্নেহলতা তাহাকে তাহার সংকল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে ; অজিতকুমারের মৃত্যু ব্যতিরেকে স্নেহলতা কোথাও সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না, একথাও জানাইয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া সুকুমারের চিত্তে নানা চিন্তার উদ্রেক হইল। স্নেহলতা তাহাকে প্রতারণা করিতেছে, এরূপ সন্দেহও তাহার মনে স্থান পাইল।

—:০:—

কল্যাণীর অদৃষ্ট।

(গল্প)

—:০:—

(১)

বীণা দৈনিক জীবনের একান্ত নৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া যখন বাড়ী ফিরিয়া যায়, তখনও কল্যাণী কি যেন ভাবিতেছিল। কি ভাবনার মধ্যে সে তাহার আপনাকে খুঁজিতেছিল—হারাইতেছিল, সে তাহা জানে না। অনন্ত ভাবনার চঞ্চল-প্রলোভন তাহার কোমল হৃদয়কে ভাঙ্গিতেছিল—গড়িতেছিল। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের অধীরতা ও গ্লানিময় অবসাদের নিশ্চলতায় সে যেন দুলিতেছিল। সে ঘরের ছাদের দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি স্থির—অপলক। কত কি ভাবিল, তাহার ভাবনা ফুরায় না। কপোলে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছে। অশ্রুভারাক্রান্ত লোচনের আয়ত প্রান্ত হইতে অস্পষ্ট ও ক্ষীণতম অশ্রুধারা অলক্ষিতে আকার পাইয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর গতির সহিত যেন তাহার জীবনের গতি প্রতি মুহূর্ত্তে দূরতর হইতেছিল। আশার উন্মত্ততা কিংবা শঙ্কার বিপুল জড়তা তাহার সমগ্রকে দামন্ত ও কুণ্ঠিত করিয়া যেন কখন কোথায় কি প্রকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। ব্যথিত চিত্তে অবিশ্রাম চিন্তার ক্ষণিক অবসাদে সে মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতেছিল। হৃদয়ের অন্তরালে থাকিয়া যে চিন্তা ভাবনা কখন কোন্ তাহার কিরূপ প্রকারে পরিত্যক্ত হইতেছিল সে তাহার কিছুমাত্র জানিতে পায় নাই—তখন বুঝি তাহার আসিবার পথে

তাও ছিল না। হঠাৎ, যেন সে কি ভাবিতে ভাবিতে বলিল—তবে বুঝি মৃত্যুই সহায়। এই বলিয়া সে তাহার ভাবনার জগত ছাড়িয়া এই মর জগতে ফিরিয়া আসিল। গভীরতম দুঃখের একটা শোকপূর্ণ সুদীর্ঘ নিশ্বাস যেন তাহাকে পুনরায় এই নির্ম্মম পৃথিবীর সঙ্গে নবভাবে পরিচিত করিল—বাঁধিয়া দিল। সে দেখিল—সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে শ্যামা সান্ধ্য-প্রদীপ হস্তে তাহার প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে।

শ্যামা কহিল -কি গা রাণি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঘরে আলো দিস্‌নি যে? তোকে এ কথাটুকু রোজই বোলতে হয় কেন?

কল্যাণী কি যেন ভাবিতে ভাবিতে অপ্রস্তুত-ভাবে বলিয়া ফেলিল—তাহা আমি টের পাই নাই।

শ্যামা।—তা' পাইবে কেন? সারাটা দিন বীণার সঙ্গে কথা কয়েই কাটিয়েছ, আর এখন বুঝি বসে বসে কি ভাব্‌ছিলে; তা আর টের পাইবে কেন গা? শ্যামা দাসী আছে কিনা, তাই তোমরা এখন টের পাওনা। নিজের ক্যেরে চোলতে হোলেই বেশ টের পেতে।

শ্যামা রাগে গর গর করিয়া আরও কত কি যে বলিতেছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। পরকীয় ত্রুটির ক্ষীণতম আভাসে শ্যামা জ্বলিয়া উঠিত। ইহা তাহার বাতুলেয়ালী বা রসিকতা নহে স্বভাবের বিশিষ্টতা। কল্যাণী তখন একেবারে বিস্মিত ও অধীর হইয়া গিয়াছে। কোন অচিন্ত্য ও অচিন্তপূর্ব্ব বাণীতে তাহার এতাদৃশ বিপৎ-পাত হইয়াছে, সে তাহা এতাবৎকাল জানিতে পারে নাই। নীরবে যেন সে অন্যমনস্কভাবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কল্যাণী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা। সূর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মির প্রাখর্য্য এবং প্রফুল্ল কৌমুদীর স্নিগ্ধতার সুচারু সমাবেশ তাহার মুকুলিত সৌন্দর্য্যকে যেন বিচিত্রতার মধ্যে বিপুল মহিমায় উদ্ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ঝটিকার উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা এবং বিশাল আকাশের গাম্ভীর্য্য তাহার লাবণ্যের মাধুরী উদ্ভাসিত হইয়া আছে। রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তির ভীষণ সংহার-বিভীষিকা ও করুণাময়ী মাতৃ-মূর্ত্তির স্নেহ-আহ্বান তাহার মধুরোজ্জ্বল কান্তিতে যেন বিকশিত। সে তখনও কুমারী। তাহাকে সকলে আদর করিয়া রাণী বলিয়া ডাকিত। সে শৈশব হইতেই পিতৃহীনা। মাতা বীরবালার সংসারে একমাত্র বন্ধন কল্যাণী, জ্যেষ্ঠতাতের সহস্র অত্যাচার ও উৎপীড়নের কোলে আশৈশব লালিতা হইয়া আসিয়াছে। তাহার পৈতৃক সম্পত্তি যথেষ্ট থাকিলেও জ্যেষ্ঠতাত দুর্গাকৃপা রায় তাহাদিগকে অত্যধিক দৈন্য ও অভাবে রাখিতে কখনও ত্রুটী করেন নাই। শৈশব হইতে তাদৃশ অত্যাচারের নিপীড়ন এবং মাতা বীরবালার শ্রান্তিহীন—অবিরাম শিক্ষাদানে সে আপনাকে তবৎ সংসারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে সে সংসারকে ভালরূপে চিনিতে পারিয়াছিল। সে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণের সহিত বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যদি কঠোর সংসার তাহাদের জীবন সংগ্রামের জন্য এমন নিদারুণ, বিভীষণ

অনুমানের রাইয়া না পূর্ণোদ্দীপিত, তবে এতদিন এ যৌবন সুলিলী অনুক্ত লালনা লইয়া তেমন বিচিত্র উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিত না।

পরদিন প্রাতে যখন কল্যাণী জানিতে পারিল যে, ধনপুরের দীননাথ সেন নামক জনৈক ভদ্রলোক তাহার বিবাহার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সে যেন কি এক অদ্ভুতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যে চকিত হইয়া উঠিল। সে চাঞ্চল্য কি যে শঙ্কাপূর্ণ, কি যে জ্বালাময় তাহা অবর্ণনীয়। সে একবার প্রত্যয়ের নিমিত্ত দ্বিতলের গবাক্ষমধ্য দিয়া মণ্ডপের বারাণ্ডার দিকে চাহিল। দেখিল, তাহার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় কোন একআগন্তুক ভদ্রলোকের সহিত কথোপকথনে ব্যস্ত। কিন্তু আগন্তুক মহোদয়ের সুঠাম গঠন ও বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদাদি তাহার দুর্ব্বল চরিত্রের রুক্ষতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির দৈন্যপূর্ণ হীনতাকে প্রাণান্ত চেষ্টায় ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। চেষ্টার আলোকে কখন স্বভাবের অন্ধকার দূরীকৃত হইয়াছে? সেন মহাশয়ের তাবৎ দৌর্ব্বল্য ও হীনতা চেষ্টার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিল না। কল্যাণী ইহা দেখিল,—ভাবিল ও বুঝিল। বুঝিল বলিয়া তাহার হৃদয় যেন একটিবার বিশেষ ভাবে কম্পিত হইল। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে আপনার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

আজ বীরবালা কল্যাণীর শয়ন গৃহেই বাসিয়া। তাহার অন্য কোন দুঃখ বা কষ্ট ছিল না। বীরবালা কল্যাণীর দিব্যকান্তিন জীণিতা অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাণি, মা আমার, তোর কি হোয়েচে? কল্যাণী অসুখের ভান করিয়া কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল। মাতার প্রাণ আশ্বাস লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকে না। তিনি কল্যাণীর অসুখের কথা শুনিয়াই কত কি আকাশ পাতাল ভাবিয়া অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গভীর বিরক্তির সহিত কল্যাণী যেন অপ্রস্তুতভাবে বলিয়া ফেলিল আমায় এত বিরক্ত করোনা, একটু ঘুমুতে দাও।

বীরবালা জানিত যে তাহাদের সুখ দুঃখের কথা কর্ত্তাদেবের কাণে গেলেও তাহার কোন প্রতিকারের সম্ভাবনা একান্তই বিরল। তাই তিনি শুদ্ধ পরিচারিকা শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন দেখত দিদি, তোর রাণীর নাকি কি অসুখ কোরেচে। নির্ব্বাক শ্যামা মুখখানি একটু ফুলাইয়া অতি মৃদুল গমনে কল্যাণীর শয্যার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি গা রাণি, তোর কি অসুখ কোরেচে গা!

কল্যাণী।—তুমি কোন কবিরাজ মহাশয় এলে যে তোমায় একান্তই তা না বলিলে নয়! এত বিরক্তও করিতে জান!

শ্যামা।—আপদ বিপদ আমার ঘাড়ে বোলেই! নয় ত আমার কি এত গরজ পড়েছে!

এই বলিয়া শ্যামা অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। বীরবালা কল্যাণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন! ভাবিতে ভাবিতে খুবই ভাবিল। দীর্ঘক্ষণের পর দীর্ঘনিশ্বাস তাহার আননের গভীরতাকে পরিমিত করিতেছিল। ইতিমধ্যে

ব্যাধা বহির্ব্বাটিতে আগন্তুকের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিল।

পাড়ার ছেলে মেয়েরা সন্ধ্যার পর শ্যামা দিদির নিকট রূপকথা শুনিতে যাইত। আজ যাহারা গেল, তাহারা নিতান্ত বিরূপ কথা শুনিয়া শ্যামাকে এক অদ্ভুত ভাষায় গালাগালি দিতেছিল। ক্রুদ্ধ শ্যামা আরও রাগিল। ন্যায় অন্যায় সকল কথাতে সে সম্পূর্ণ অজিজ্ঞাসিতা হইয়াও বাড়ীতে কলহের এক মহাপ্রলয় সূচনার চেষ্টা পাইতে লাগিল। ব্রহ্মচর্য্যনিরতা বিধবা বীরবালা আপনার অদৃষ্টকে চিন্তা করিতে২ তখন কল্যাণীর শয্যাপার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছে। বহির্বাটীর কোন খবর সে পাইল না পাইবার চেষ্টাও করিল না। যাহার অন্তর্জগত বিধাতার অজ্ঞাত ইচ্ছায় পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গিয়াছে, বহির্জগতের কোলাহল ও বৈচিত্র্যে কখন সে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে কি?

কর্ত্তা দুর্গাকৃপা রায় রাত্রির অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত কথোপকথনে অতিবাহিত করিয়া শয়নগৃহে কর্ত্রীঠাকুরাণীকে কল্যাণীর বিবাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব যথারীতি বিজ্ঞাপন করিলেন। অবসরক সাংসারিক আলোচনার অবসানে রায় মহাশয় কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সম্মতি গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শায়িত হইলেন।

পরদিবস প্রাতে আচার্য্যের যুক্তি সম্বলিত জ্যোতিষশাস্ত্রালোকে বিবাহের দিন নিরূপিত করা হইলে জীবনলাল সেন হর্ষোৎফুল্ল অন্তঃকরণে স্বপুরে প্রস্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ পরিবার ও প্রতিবেশীর মধ্যে প্রচারিত হইল। বীরবালা শুনিল, কল্যাণী শুনিল, সকলের সঙ্গে বীণাও শুনিল। প্রীতিপূর্ণ আহ্লাদে সকলেরই মুখে হাসি, নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে পুলকের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার সঞ্চারিত হইল। কল্যাণীর নীরব অশ্রু-বিসর্জ্জনের মধ্যে মাত্র বীণা একটু ম্লান ও শঙ্কিত হইল। সুখের পরিব্যাপ্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে, আনন্দের মুখরিত কোলাহলের মধ্যে, উৎসবের উন্মাদক বিজয়তার মধ্যে দুঃখিনী বীরবালা, কি যেন শোকের অশ্রুতপূর্ব্ব আর্ত্তনাদে মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে বীণা কল্যাণীর সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী ও সখী। শৈশবের সখ্য তাহাদিগকে একটি অপূর্ব্ব অদৃশ্যবন্ধনে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। এবং দুর্গাকৃপা রায় বংশীয় গৌরব হীনতায় ও ভিত্তিহীন গৌরবের অভিমানে স্ফুরিত একজন বিজন, মুগরবাসী জমিদার মাত্র।

২

বীণা কল্যাণীর বিবাহ-সংবাদ শুনিয়াই কল্যাণীর নিকট ছুটিয়া আসিল। তখনও তরুণারুণ প্রভাতের স্নিগ্ধ স্বর্ণালোক গবাক্ষপথের মধ্য দিয়া কল্যাণীর শয্যা স্পর্শ করিয়া আছে। অরুণালোকের ঔজ্জ্বল্যে কল্যাণীর সুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছিল। কিন্তু এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যেও এক প্রকার বিষাদ-মলিন-ছায়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কান্তির উপর অন্তহীন অনবরিত আকাশের মত অতি গম্ভীর ভাবে আসিয়া পড়িয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ বিষাদ মূর্ত্তি কখনও প্রকাশিত দেখিয়াছেন, তাহারা কল্যাণীর এই সৌন্দর্য্যের বুকে যে কীদৃশ ভীষণতা, মলিনতা এবং হতাশের শ্রীহীনতা উদ্ভাসিত ছিল—জানিতে পারিবেন। আর যাহারা সৌভাগ্য বশতঃ তাদৃশ অবস্থায় পতিত হয়েন নাই, তাহারা যে ইহাকে উদার সৌন্দর্য্যের নির্ম্মল ও সরল মুক্ত-মাধুরী বলিয়া মানিয়া লইবেন, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বীণা কল্যাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিল কল্যাণী তখনও ঘুমাইতেছে, কিন্তু তাহার নিদ্রার তেমন কোন গভীরতা সে তদবধি অনুমাণ করিতে পারিল না। সে বুঝিল যে, দুশ্চিন্তা-তন্দ্রার মধ্যে যে পীড়িতহৃদয় একেবারে সংক্ষুব্ধ হইয়া গিয়াছে, দিব্য জাগরণের হৃদয়োচ্ছ্বাসে তাহাকে সঞ্জীবিত ও উৎফুল্ল করিবার চেষ্টা তাহার মধ্যে একমাত্র বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবিয়া বীণা কল্যাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিল। সুপ্তোত্থিতা কল্যাণী হঠাৎ চমকিয়া বলিয়া উঠিল—কে ও রণেন্দ্র ?

বীণা হাসিল, কিন্তু এই হাসি কে মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে কি অব্যক্ত আশাময় সম্ভাবনা প্রাণ লাভ করিয়াছিল; আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ মাধুর্য্য যাহারা কখন বাঁচিয়াছিল, তাহারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তাহারাই বুঝিবেন যে অশ্রুধারার কীদৃশ অন্তরাল সেই হাসি প্রকাশ লাভ হইয়াছিল।

কল্যাণী জাগিয়াই দেখিল যে, পার্শ্বোপবিষ্টা বীণা তাহার সুন্দর অধরের মধ্যে আশাপূর্ণ সখীত্বের একটি মধুর হাসিতে আত্মকে আবৃত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। বীণা কল্যাণীর সুদীর্ঘ নিদ্রার প্রশ্ন করিলে সে বলিল,—আশীর্ব্বাদ কর, দিদি যেন অচিরেই আমার এমন ভাবে মহানিদ্রা হয়। বীণা শিহরিয়া উঠিল; সংজ্ঞাহীন জীবনের নিশ্চলতায় সে একটি বিচিত্র প্রমাদকে যেন মূর্ত্তিমান দেখিল। অতি মৃদুল কণ্ঠে, বীণা কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন দিদি, এমন কথাটা বোল্লে কেন ? কল্যাণী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কে বলিতে পারে যে সেই নিশ্বাসের বুকে কি তপ্ত আগুন শিখা বিস্তার করিয়া আছে। অবশেষে বীণার অবিরাম উৎপীড়নে সে গত্যন্তর হইয়া বলিল, এতক্ষণ তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ।

বীণা। কই, আমি কিছু জানি না।

কল্যাণী। একটা সহায়হীন দুর্ব্বল জীবনের অবসানের জন্য এতটুকু মিথ্যার আয়োজন কেন ?

বীণা।—দিদি, ক্ষমা কর ও আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর। আমি ও সকল কিছু জানতে পারিনি ব'লে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। সব বল, আমাকে বোল্‌তেই হবে।

অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কম্পরুদ্ধ কণ্ঠে কল্যাণী কহিল—দোর আটকিয়া দাও, আমি জন্মের শোধ তোমায় কয়টা কথা বলিব, বলিতে পারিব কিনা জানিনা। চোখে জল আসিতেছে, কণ্ঠও যে প্রায় রোধ হইল।

বীণা।—[illegible] বুক [illegible] হবে। দেখ, কেন [illegible] আরোপ ক'রো না। [illegible] মমতাময় [illegible] কথা [illegible]।

কল্যাণী।—বলিব আর কি, তুমি সকলই জান।" তাহার চরণে এ হৃদয় প্রাণ মন, এমন কি জগতের সমুদয় আপনারটুকু অর্পণ ক'রে জন্মের সার্থকতা উপলব্ধি করেছি,' আমি তাহাকে—

বীণা।—হাঁ, বলত দিদি, তুমি জাগবার আগে কা'কেও ডেকেছিলে কিনা? সে কি সত্যপূর্ণ স্বপ্ন?

কল্যাণী একটু বিস্মিত হইয়া কহিল—বাঃ তুমি তা' কি ক'রে জান?

বীণা।—আমি তোমার গায়ে হাত দিলে, তুমি বল্লে "কে ও বরেন্দ্র," তাই—।

কল্যাণী।—হাঁ দিদি, সত্যই আমি তাঁকে দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম যে তিনি তেমনিভাবে আমায় ঠাকুরবাড়ীতে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"বল কল্যাণী, বল তুমি আমার," আমার জড়-নিশ্চলতার মধ্যে সমগ্রত্ব যেন মুহূর্ত্তেকে বিলীন হইয়া গেল। আমি যেন কাঁদিলাম—চক্ষু বুজিয়া কাঁদিলাম। ক্ষণেক পরে চাহিয়া দেখি তিনি—সেই তিনি, তেমন ভাবে তখনও আমায় জড়িয়ে আছেন। চাহিলাম—বিস্মিত হইলাম; আবার চাহিলাম—সাধ মিটিল না; আবার চাহিলাম—কি যেন এক মদিরাময় স্বপ্নের উচ্ছ্বাসে সমগ্র জীবন ডুবিয়া গেল। জীবনের ভাবের আবেশে কি যেন বলিতে চাহিলাম—ভাষা জুটিল না;—কি যেন একি মহান্ দৈন্যে হৃদয় জড় হইয়া আসিল;—অতর্কিতে কহিলাম, "কে ও বরেন্দ্র!"

বী।—আচ্ছা বল, এখন কি করিবে?

ক।—করিব—করিব আর কি? প্রাণের ইচ্ছার মধ্যেই যে হৃদয়ের ভাব নিহিত থাকে।

বী।—দিন ত দূর নয়। এই বিপদ কি ক'রে এড়াবে?

ক। তা'ই ভাবিতেছি।—তবে শোন! কোন বিপদ আমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। আগে বল তুমি ইহার বিন্দু-বিসর্গ কা'কেও জানিতে দিবে না।

বিস্মিতা বীণা অধিকতর বিস্মিত ও ভীত হইল। শঙ্কার জড়িত কণ্ঠে সে কহিল "তাহাই হইবে বল।"

ক।—আমি মরিব;—মরিব না কেন? যাহার মরণে নিষ্কৃতি তাহার জীবনে প্রয়োজন কি? যাহার জন্য বিগলিত অশ্রুধারার মধ্যে আপনাকে এতদিন সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলাম, তিনিই যদি জীবনে একান্ত দুর্লভ, তবে আর বাঁচিয়া ফল কি? কার জন্য বাঁচিব? দেবতার অঞ্জলিতে পিশাচের অধিকার কি? কল্যাণী—হতভাগিনী কল্যাণী আজন্ম নারী হৃদয়ের মহত্তর সাধনা ও উচ্চতর কর্ত্তব্যকে দেখিয়াছে—চিনিয়াছে বুঝিয়াছে; সে কখনও মনুষ্যত্বের বিনিময়ে পৈশাচিকতাকে বরণ করিবে না। এতক্ষণ বুঝিয়াছ! না বুঝে থাকত শোন—তোমরা কল্যাণীকে চিরবিদায় দিতে প্রস্তুত হও।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া প্রায় সংজ্ঞাহীনা বীণা কহিল, কল্যাণী তুমি হতভাগিনী কিসে? যাহার জীবন দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত, সে যদি হতভাগিনী, তবে ভাগ্যবতী কে রাখি? তোমার জীবনে তোমার অধিকার কি বল? যদি কখনও সেই দেবতার এই অঞ্জলি গ্রহণ করিবার সুযোগ ঘটে,—

ক।—তবুও মরিব।

বী।—তবুও মরিবে? ছি ছি, এই তোমার মনুষ্যত্ব! এই তোমার নারী হৃদয়ের উচ্চতর কর্ত্তব্য জ্ঞান!

ক।—তবে তুমি কি করিতে বল?

বী।—তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে! যতদিন না তুমি তাহাকে প্রাপ্ত হও ততদিন তোমাকে তাহার জন্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ইহাতেই জীবনের সার্থকতা, ইহাতেই মনুষ্যত্বের অতুল-গৌরব।

ক।—অমঙ্গলের প্রসারিত বাহু এই যে বেষ্টন করিতে আসিতেছে; কিন্তু ভাবিয়া দেখ বীণা, এই দিকটা কি নির্ব্বিঘ্ন, কি নিষ্কণ্টক। আমাদের যে পরজন্ম আছে, আমাদের যে পরলোক আছে!

বী।—তাহা আছে কিনা জানি না। যাক সে কথা; আপাততঃ বল তুমিও আমার একটি কথা রাখবে।

চঞ্চল হরিণের মত কল্যাণী থমকিয়া কহিল,—হাঁ বল।

বী।—তুমি আত্মহত্যা করিতে পারিবে না। বীণাও তোমার জীবনের চারিপাশে প্রাচীর গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত কথা হইয়া গিয়াছে। মাতা বীরবালা বদ্ধ-কপাটে আঘাত করিতে করিতে ডাকিলেন—কল্যাণী। কল্যাণী সাড়া দিল। বীণা দ্বার অর্গল মুক্ত করিয়া দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। বীরবালা গৃহে প্রবেশ করিলে হৃদয়ে অপরিমিত গুরুভার লইয়া বীণা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বীণাকে দেখিয়া কেহ হাসিল, কেহ কত কি সন্দেহ করিল, কেহ বিদ্রূপচ্ছলে দুইটা শ্লেষ বাক্য শুনাইয়া দিতে ত্রুটী করিল না। ম্লান-গম্ভীর বীণা নীরবে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

বীরবালা কন্যার অসুস্থতার কারণ বুঝিলেন—বুঝিলেন বলিয়া যেন অভ্যন্তর হইতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইতেছিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা ছাড়া এ বিবাহে আর কাহারও মত ছিল না। কর্ত্তা স্বয়ং ঔদ্ধত্যবশে এই সম্বন্ধে রাজী হইয়াছিলেন। তাহারও কারণ ছিল। একমাত্র সঙ্গতিহীনতাই তাহাকে এই অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত করিয়াছিল।

বীরবালা নিরুপায়।

(৩)

বীরবালার পিত্রালয় তাহার আপনার বাড়ী হইতে তত দূরস্থ নহে। তাহার পিতা রামরাম সেন তেমন সঙ্গতিপন্ন না হইলেও একজন সম্রান্ত ও পদস্থ লোক। দেশ ও দশের নিকট তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি প্রায়শই কন্যা বীরবালার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেন। যে দিন কল্যাণীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, সে দিন তিনি যদিও তথায় উপস্থিত ছিলেন তথাপি পূর্ণ অসন্তোষের মধ্যে তিনি আপনার কিম্বা বীরবালার পক্ষীয় কোন স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। ইতিমধ্যে বীণা বীরবালার নিকট কল্যাণীর সমস্ত কথা পরিব্যক্ত করিয়া দিয়াছিল। বীরবালা যথাসময়ে পিতা রামরাম সেন মহাশয়কে তাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। সেন মহাশয়ও ধীরে ধীরে সমস্ত কথা কর্ত্তা মহাশয়কে বলিলেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্ত্তাপুরুষ ক্রোধান্ধ হইয়া যে

প্রকার উৎসম্না ও তিরস্কারে সেন মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত, তবে স্থুলত কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

কর্ত্তা। আপনি কি প্রকারে জানেন?

সেনমহাশয়। জানাইয়াছে বলিয়াই জানি।

ক। কে আপনাকে জানাইল?

সে-ম। বীরবালা।

ক। তাহা মিথ্যা।

সে-ম। কি প্রকারে বুঝিলে?

ক। তবে তাহাদের ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত সাহস।

সে-ম। তাও বা যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আপনি মোড়ল হ'য়ে এমন কাজটা করিলে কেন?

ক। তা জিজ্ঞাসা করিবার আপনি কে?

সে। আমি কে, তুমি আমায় চেন না? তোমায় কোলে কাঁধে করে মানুষ করেছি; হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছি;—তুমি আমায় চিন্‌বে কেন? আমি দাঁড় করিয়ে দিয়েছি বলে তুমি দাঁড়িয়েছ; আমি চালিয়েছি বলে তুমি চলেছ—তুমি আমায় চিনবে কেন? আমি রামরাম সেন। আমায় চিনবার সময় এসেছে—চিনবে।

এই বলিয়া সেন মহাশয় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কর্ত্তা দুর্গাকৃপা রায় আপনার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অণুমাত্র না ভাবিয়া, একটা মুহূর্ত্তের জন্যও অনুতপ্ত না হইয়া প্রাণের ভিতর আপনার সংকল্পকে দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। পুত্র অজিনাক্ষ ও দক্ষিণা, ভার্য্যা কামদায়িনী, বিধবা বীরবালা অনেক কাঁদিল। বিবাহের ভাবী অকল্যাণ আশঙ্কাকে অনেক প্রকারে কর্ত্তার হৃদয়ের মধ্যে উদ্রিক্ত করিয়া দিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু নিষ্ফলতায় সেই চেষ্টার চিরসমাধি হইল। কর্ত্তা অবিচল। তাহার হৃদয় পাষাণ-দ্রবীভূত হইল না; সংকল্প দৃঢ়—একটুও টলিল না। সাহস অদম্য—ভীতি-চঞ্চল হইল না। তাই তিনি সগর্ব্বে আত্মপ্রতিজ্ঞা পরিপূরণের জন্য আপনাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করিলেন। বিঘ্ন বহুল সাধন-সোপানে তিনি অমিত পৈশাচিক শক্তি লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড এই ঘটিল যে, আপনাদের অপরিচিত, আমাদের কল্যাণীয় জনদরাজ রণেন্দ্রনাথ গুপ্তকে বীণা এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই:—

আর্য্য! এই অল্প কয়দিবসের মধ্যে কি যে মহা বিপ্লব সংঘটিত হইয়া গেছে, তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে, এই কথা কি প্রকারে আপনাকে বুঝাইব? অশিক্ষিতা নারীর দোষ মার্জ্জনা করিবেন—আজ আপনাকে কয়েকটী রূঢ় কথা বলিব। আপনি নিষ্ঠুর! আপনি জানেন যে আপনি যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন, সে আপনারই জন্য তাহার নিষ্ঠুর জগতে সুখকে ভস্মীভূত করিতে চলিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহাকে ত্যাগ করা কিংবা তাহাকে পাইবার জন্য নিশ্চেষ্টতা কি একান্তই হৃদয়-হীনতা নহে? যাহার মধুময় এমন সুকুমার জীবন যাহা সংসারের এত কাজে আসিত, তাহা আজ আপনারই নির্ব্বিচার অবজ্ঞায় উজ্জ্বল-ভস্ম হইতে চলিয়াছে। যদিও আপনি ভাগ্যবান

মনে করেন, তবে আপনার কন্যাটীকে একটী বারের জন্য দর্শন দান করিবেন,—অন্যথা না হয়। ইহাই প্রথম ও শেষ প্রার্থনা।

ভবদীয়া—

প্রণ লতা বীণা।

এস্থলে রণেন্দ্র নাথের একটু পরিচয় আবশ্যক। তিনি গোবিন্দপুরের ত্রিপুরাচরণ গুপ্তের পুত্র। সাংসারিক অবস্থা তাহাদের তেমন সচ্ছল না হইলেও একান্ত যে মন্দ ছিল, এমত বলা যায় না। পুত্র রণেন্দ্র নাথ একপক্ষে যেমন ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, পক্ষান্তরে রূপে গুণেও অনিন্দনীয়। বয়স তখনও বিংশ অতিক্রম করে নাই।

রণেন্দ্রনাথ দুর্গাকৃপা রায়ের কোন সম্পর্কিত না হইলেও তিনি নলিনাক্ষের সৌহৃদ্যের অনুবলে প্রায়শই তাহাদের বাড়ী আসিতেন ; এমন কি সময় সময় তিনি সে বাড়ীতে পক্ষ দুই তিনের জন্য অবস্থানও করিতেন। সেই সুযোগে কল্যাণীর সহিত তাহার পরিচয় ও আন্তরিক অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। বস্তুত, রণেন্দ্রনাথের রূপে গুণে একমাত্র কর্ত্তা ভিন্ন সকলেই তাহার মুগ্ধ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা সকলেই বুঝিল যে রণেন্দ্রের হস্তে কল্যাণী সমর্পিত হইলেই তাহার একটী সুন্দর সদ্গতি করা হইবে। কিন্তু মানুষী চেষ্টা যাহা গড়িতে চাহে ভগবানের পুণ্য-ইচ্ছা বুঝি তাহার বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের শত চেষ্টার সম্মিলিত উদ্যমের উপর স্বার্থের বিজয়-কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। তাহারা যাহা গড়িতে চাহিল, দেবতা তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিলেন। নির্ব্বন্ধতার সমগ্র চেষ্টা মিলাইয়া গেল। কর্ত্তা বিবাহে স্থিরসংকল্প হইলেন।

বলিয়া রাখা ভাল যে শ্রীযুক্ত রামরাম সেন মহাশয় ইতিমধ্যে দিগ্বিদিকে কল্যাণীর বাবতীয় দোষ প্রচারিত করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য তাহা সর্ব্বথা মিথ্যা। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই তিনি তাহা প্রচার করিতে ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এবং সৌভাগ্যবশে দীননাথ সেন মহাশয়েরও তাহা অশ্রুত রহিল না। স্বার্থের খাতিরে তিনি তাহা উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। সেন মহাশয় তাহাতেও নিরাশ হইবার পাত্র নহেন। নলিনাক্ষ ইত্যাদির সঙ্গে একত্র হইয়া রণেন্দ্র নাথকে বর নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন। ইহা ত্রিপুরাচরণ গুপ্ত কিংবা তদীয় পরিবারের কেহই জানিল না—জানিতে পাইল না।

(৪)

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। বিমলা বীণাকে নির্জ্জনে বসিয়া কত কি বিষাদ চিন্তায় নিমগ্ন। নলিনাক্ষ ইত্যাদি অন্যান্য প্রতিবেশীও কি এক অপূর্ব্ব বিষাদে ক্লিষ্ট ও মলিন হইয়া আছে। কিন্তু আজ এক নূতন ভাবের সূচনা হইতেছিল। বিবাদিনী বীণা কখনও বহির্দিকে কখনও বা কল্যাণীর কক্ষাভিমুখে প্রসন্নবদনে যাতায়াত করিতেছে;—কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে না;—লক্ষ্য করিলেও তাহার গতি অনাবিষ্ট,—তাহার মৌন-নীরবতা সম্পূর্ণ অভিভাবিত—অক্ষুণ্ণ। সে চঞ্চল হরিণ শিশুটীর মত ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। অবেণীসংবদ্ধ আলুলায়িত